একটি প্রেমের কাহিনী

বোম্মানা বিশ্বনাথম

মণ্ডল বুক হাউস
৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ সাল

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীগণেশ বসু

ব্লক নির্মাতা
রয়েল হাফটোন কোং

মুদ্রাকর
শ্রীনির্মলকৃষ্ণ পাল
নির্মল মুদ্রণ
৮, ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

দাম দু' টাকা

শ্রীগোপাল মহেশ্বরী 'প্রতাপ'

বন্ধুবরেষু—

লেখকের অন্য বই ঃ

কেরল সিংহম্

একসূত্রে গাঁথা

আধুনিক ভারতের গল্প সঞ্চয়ন

আধুনিক ভারতের কবিতা সঞ্চয়ন

কেরালার গল্পগুচ্ছ

অন্ধ্রের গল্পগুচ্ছ

ভূমিকা

"একটি প্রেমের কাহিনী" উপন্যাসের রচয়িতা গুড়িপাটি ভেঙ্কট চলমের বয়স এখন আটষট্টি। বহু উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক নিবন্ধ, শিশুসাহিত্য, পত্রাবলী প্রভৃতি রচনা করেছেন তিনি। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে ময়দানম, ব্রহ্মনীকম, আমিনা, বিবাহম, অরুণা, দৈবমিচ্চিনাভার্য়া প্রভৃতি সমধিক খ্যাত। চরিত্র ফোটানোর জন্যই যেন তাঁর কাহিনী গড়ে ওঠে। লেখনীর মাত্র ক'টি আঁচড়েই মানুষের অন্তর্জগতকে তিনি তুলে ধরেন। নীতি ও ধর্মের শাসনের চেয়ে মানুষের হৃদয়কেই তিনি উঁচু আসনে বসাতেন বারে বারে।

বর্তমান উপন্যাসের তেলুগু নাম ময়দানম। বাহুল্য হলেও বলা প্রয়োজন যে উপন্যাসটি মূল তেলুগু থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছি। ময়দানম প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদগ্ধ সমাজে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। রচয়িতাকে একাধারে সাধুবাদ ও নিন্দাবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।—

বোম্মানা বিশ্বনাথম্।

॥ এক ॥

কেউ আমায় 'ভেগেছে' বললে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। মাঝে কিছুদিন মানুষের ভিড়ে ছিলাম না। ছিলাম কিছুটা নির্জনে। আমার চারপাশে ছিল সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, সবুজের মেলা, খরস্রোতা নদী আর ঢেউখেলানো পাহাড়ের সারি। উপরে নীল আকাশ। নীচে নরম মাটি। সে-জীবন সুন্দর ছিল। ছিল মনোরম। সে-ভূমি ছিল পুণ্য। সেখানে আমার মনের কবি-লতাটি আড়ালে ছড়িয়ে উঠেছিল তর-তর করে। ওই ভাবের তলে এক ফল্গুধারা উচ্ছ্বাসে উঠেছে ছাপিয়ে—সেখানে মন নির্ঝরিণীর মত এঁকেবেঁকে চলেছিল খিলখিল করে হাসতে হাসতে। কত সুন্দর পরিবেশে না থাকলে আমি ঘর-সংসার, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং স্বামীকে ছেড়ে অতদিন কাটাতে পেরেছি।

আজ আমীর এবং সুলেমানের সঙ্গে আমার চাউনি, ভালবাসাবাসি সব শেষ হয়ে গেছে।

গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে কতলোক আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে! আমি ওদের কাছে একটা দেখার বস্তু। ভিড়ের মধ্যে থেকে কত কথা কানে আসছে।

—বেশ দেখাচ্ছে মাইরি?

—দিব্যি খুলেছেতো চেহারাটা!

—ডাগর মেয়ে, মনের মানুষ পেলে…

বুঝলাম লোকে আমাকে কিভাবে নিয়েছে। আমীরের দেখা না পেলে আমিও হয়ত আজ আর পাঁচজন মেয়েমানুষের মতই স্বামীর-ঘর করতাম। আমিই কেন! এমনভাবে অন্য কারো

সঙ্গে পরিচয় হলেও ওর সঙ্গে চলে যেত। মুখে অবশ্য স্বীকার করবে না কেউ।

তার আকর্ষণকে অগ্রাহ্য করা যায় না। আমার বা অন্য কারো সাধ্য নেই তাকে এড়িয়ে চলার। বিশ্বাস হল না? অন্য কেউ সরে পড়বে না? হয়ত তাই। সেই আকর্ষণকে অনুভব করার মত মনও তো চাই। মধ্যাহ্নের বাতাস যেমন উত্তপ্ত হয়ে থাকে, আমারের সুবিশাল বুকে আছে সেই উত্তাপ। সেই উত্তাপকে উপেক্ষা করার মত শক্তি কার আছে! থাক্ সবাই হয়ত ধোয়া তুলসীপাতা। সে-বিষয়ে তর্ক নাইবা করলাম।

একদিন সকালে ওঁর সঙ্গে কি এক বৈষয়িক কথা বলার জন্য এসেছিল আমীর। ওঁর বৈঠকখানায় কারো কথার আওয়াজ শুনতে না পেয়ে ভেবেছিলাম সে-ঘরে কেউ নেই। তাই কফি নিয়ে ঐ ঘরে ঢুকলাম। ঢুকে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল সে যেন আমার পিঠে তার চোখ নিবদ্ধ করেছে। তার দিকে আর ঘুরে না তাকিয়ে সোজা ভিতরে চলে গেলাম। কিন্তু সারাদিন আমার মনে হল কার চোখ যেন আমার পিঠে গেঁথে আছে। পরদিন গোধূলি বেলায় অন্যান্য দিনের মত বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ সেই দৃষ্টি এসে গাঁথল আমার গালে। ঘুরে তাকালাম তার দিকে। ওর চোখে চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা পেলান। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেলাম। কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! কী জ্বালা সেই চোখে। অনেকক্ষণ ভাবলাম তার সেই প্রখর দৃষ্টির কথা। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা-সকাল সে ওঁর সঙ্গে বৈষয়িক কথা বলতে আসত। তারপর থেকে আমি রান্না ঘরেই থাকি, আর অন্য যে ঘরেই থাকি না কেন, টের পেতাম সে যখন আসত। তার গলা শোনার আগেই টের পেতাম। সে বৈঠকখানায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মন বলত সে এসেছে। দিনে চার-পাঁচ বার

সে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাতায়াত করত। দু-চারদিন আমার মনে হত সে যেন যাতায়াতের পথে আমাকে দেখতে না পেয়ে তার চোখ আমাদের বাড়িতে গেঁথে রেখে গেছে। পরে জানতে পারলাম আমিও নাকি আমীরের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে তাকাতাম। জানলা দিয়ে হঠাৎ তাকে দেখতে পেলে মন আমার আনন্দে কানায়-কানায় ভরে যেত। কী তীব্র জ্বালা তার চোখে। সে-চোখ না দেখলে অস্বস্তি লাগত।

সেদিন দুপুরে সদর দরজা দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে আছি। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত ভরে আছে রোদ্দুর সেই ঝাঁ-ঝাঁ রোদে ঠিক জ্যোৎস্নালোকে হাঁটার মত পরমানন্দে সে হাঁটছে ঐ পথ দিয়ে। তাকাল আমার দিকে। সে যেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে আমার দিকে। আমার বহিরাঙ্গের এক একটি অংশে যেন তার চোখ গেঁথে দিচ্ছে কয়েক মুহূর্তের জন্য। সঙ্কোচ বোধ করলাম। আমার সামনে রাস্তার উপরে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে হঠাৎ এসে দরজার কাছে বুক টান করে দাঁড়াল। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গিয়ে বৈঠকখানার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম, উনি বাড়িতে নেই। আমার কথা কানে না তুলে সে এমন ভাব করে বৈঠক-খানায় ঢুকে গেল যেন তার কাছে আমার কথার কোন দাম নেই। এই বাড়ির, আমার হৃদয়ের সেই যেন অধিপতি। ঘরে ঢোকার সময় আমার হাতে তার ছোঁয়া দিয়ে ঢুকল। অন্য কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তার দৃষ্টি আমার উপরেই নিবদ্ধ। কী মোহে পড়েছে সে। চোখের পাতা ফেলছে না। জ্বল-জ্বল করছে তার চোখ। কী তৃষ্ণা! কয়েক মুহূর্ত পরে আমার মনে হল আমি যেন নিজের অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলেছি। আমি বেঁচে আছি কি মরে গেছি বুঝতে পারিনি। সেটা কি বৈঠকখানা না মহারণ্য অনুভব করতে পারছি না। নিবিড়ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে সাপটে সমস্ত শরীর জড়িয়ে

ধরে কয়েক মুহূর্ত পরে সে হারিয়ে গেল। যন্ত্রচালিতের মত খাটে বসে নিজেকে ঠিক করার চেষ্টা করলাম। এ-এক নতুন অনুভূতি। আমার একি! এটা কি সেই পুরনো ঘরই তো। অন্যান্য দিনের মত আজকেও তো রোদ উঠেছে। কিছু একটা করে সবাইকে তাক লাগানোর প্রচণ্ড ইচ্ছা চেপেছে। মন আমার খুব খুশী। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তিন লাফে বড় আরশির কাছে গিয়ে নিজেকে দেখে নিলাম। নিজেকেই নিজে চুমো খেলাম। কাউকে কি জানাবো না এই আনন্দের কথা! এই পুনর্জন্মোৎসবের কথা কোন ভাবেই কি প্রচার করব না। আমার যে কণ্ঠে কোনদিন গানের একটি কলিও গীত হয়নি আজ যেন আমি একটি আস্ত গান গেয়েছি! আজ প্রথম মোহ-মাধুর্যে আমার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমি প্রকাশ পাচ্ছি। সারা ঘরে কত আলো! সূর্যের কত আলো আমার ঘরে! আর কেউ আমার জন্য, আমাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য এতটা সাহস করবে না। আমীর, আমার আমীর! আমাকে একি করল!

উনি উপনিষদের কথা মাঝে মাঝে শোনাতেন। আমি সেকথা ভুলে গেছি! আমি আর আমি নই! সেই দিনই পুরনো রাজেশ্বরী মারা গেছে।

সেদিনের পর থেকে দুপুর হলেই আমার মন উথালি-পাথালি করত। প্রত্যাশায় প্রতীক্ষায় আমার শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে কষ্ট হত। ভাত নামানোর সময় আমীরের কথা মনে পড়লে হাতগুলো কেমন অবশ হয়ে যেত। গোটা শরীর থরথর করে কাঁপত। খাওয়ার সময় আমীরের কথা মনে পড়লে ভাত যেন গলায় দলাপাকিয়ে যেত। আর খেতে পারতাম না। অস্বস্তি বোধ করতাম। ওঁকে কাছে টেনে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরতাম। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে উনি জিজ্ঞেস করতেন, কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছি কিনা। ওঁর কোন

উপলব্ধি ছিলনা। ওসব বুঝতেন না। বুঝতেন খালি ল'-পয়েন্টের কথা। আইনের বিষয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোককে বোঝাতে পারতেন। প্রতিপক্ষের সাক্ষীর পেটের কথা কায়দা করে বের করে নিতে পারতেন। কিন্তু বউ যে কেন দুঃস্বপ্ন দেখে তা বুঝতেন না। আমাদের অনেকের ভাগ্যেই এই ধরণের স্বামী জোটে। ওরা বিয়ে করে। ওদের ঘরের বই, আসবাবপত্র এবং গাড়ির মত আমরাও একটি জিনিস মাত্র। সারা গায়ে গয়নাগাটি পরতে হয়। গোটা শরীর কাপড় দিয়ে ভালভাবে মুড়ে নিতে হয়।

আমীর দোরগোড়ায় এলেই আমাকে খুব কষ্ট করে রাখতে হত মনের তোলপাড়। তোমরা তো বলবে এ-কাম পশুদের। হয়ত তাই। আমার জীবনে আমীরের আবির্ভাবের আগে ওঁর সঙ্গে যেভাবে কাটাতাম সেটাকেই মনে করতাম একটি জীবন। ওঁর জন্য রান্না করা, কাপড় জামা এগিয়ে দেওয়া, পিঠে সাবান, লাগান, পা-টিপে দেওয়া—এইসব ছিল পাতিব্রত্যের বহিঃপ্রকাশ। আর প্রতিদানে ওর কাছে পেতাম পান থেকে চুন খসলেই গালাগাল।

আমীরের সঙ্গে সেদিন দুপুরের মত আরও চার-পাঁচটি দুপুর কাটল। হিসেব করলে সবমিলিয়ে হয়ত চারপাঁচ ঘণ্টা কাটিয়েছি। ঐ ক-ঘণ্টার মধ্যেই আমার মন যে-রোমাঞ্চ ও মাধুর্যে ভরে উঠেছে তা বিবাহিত জীবনে হয়নি।

একদিন দুপুরে আমীর বলল, আমার সঙ্গে চলে এস। মুসলমানের মুখে তেলুগু শুনছি! বাচ্চা ছেলের মত আদো-আদো কথা। তার আগে যত মুসলমানের মুখে শুনেছি, তেলুগু খারাপ লেগেছে। কিন্তু সেদিন মুসলমানের মুখে তেলুগু যেন মধুর সঙ্গীতের মত শোনাল। তার কথা বারবার ভেবে দেখলাম। দাঁতে দাঁত ঘষে কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, আসবেনা

আমার সঙ্গে? না আসলে তোমাকে খুন করে ফেলব। তার চোখে সেই প্রথম দেখলাম রোষবহ্নি। আমাকে যেন গিলে ফেলবে। কি তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টি! যেন চোখেচোখে সে অগ্নিবাণ ছুঁড়ছে আমার দিকে:

—পরে বলব। আবার যখন তুমি আসবে সুযোগ বুঝে কথা বলব।

এক সপ্তাহের মধ্যে সুযোগ মেলেনি। উনি যেদিন শহরে যাবেন সেদিন ওকে আসতে বলে দিলাম একদিন।

আমার জীবনের সেই রাতের কথা ভুলতে পারিনা। রাত দশটা। শোয়ার ঘরে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছি। অন্ধকারে কি সিল্কের জামা নজরে পড়বে? এই হীরের হার সে কি দেখতে পাবে? গায়ে একটু আতর মাখতে গেলাম—বারটাকা দিয়ে উনি কিনে ছিলেন আতরের একটি ছোট্ট শিশি। হঠাৎ মনে হল উনি যে আতর এনেছেন তা গায়ে মেখে আমীরের মন ভোলাব? লজ্জা পেলাম। শিশিটা ওখানেই রেখে দিয়ে ভাবছি। মনে হল এই জামাটাও তো ওঁরই কিনে আনা। খুলে ফেললাম সেটা। তাই তো এই শাড়ি-শায়া·····? হাসি পেল। আবার জামাটা পরে নিলাম। পরতে পরতে হঠাৎ মনে হল দেরী হয়ে যাচ্ছে। যেখানকার জিনিস সেখানেই ফেলে রেখে বৈঠকখানায় ছুটে এলাম। তারপর রাস্তার দিকের জানলার পাশে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। পাছে কেউ বাইরে থেকে দেখে নেয় এই ভয়ে সঙ্কোচ বোধ করলাম। সরে গেলাম জানলার কাছে থেকে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। পা কাঁপছে। রাস্তার আলো আমার ওপর এসে পড়ছে। পথে দু-একজনের আনাগোনা লেগেই আছে। ওদের পদশব্দ আমার বুকটাকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। বুকটা আমার ধক-ধক করছে। কেমন ক্লান্তি অনুভব করছি। আবার শোবার

ঘরে গিয়ে বসলাম। পরক্ষণেই মনে হল আমীর এসে আমাকে না দেখতে পেয়ে বুঝি ফিরে যাবে। কথাটা ভাবতেই ভয় করল। কিন্তু দাঁড়াতেই মনে পড়ল, না ওকে তো পই-পই করে বলে দিয়েছি, আমি হয় বৈঠকখানায় অথবা শোওয়ার ঘরে থাকবই। ঠিক বলেছি তো? বলার কথা অনেকবার ভেবেছি বটে। কিন্তু ঠিক বলেছি কিনা মনে পড়ছে না কেন? হ্যাঁ, বলেছি। কথাটা শুনে আমীর চোখ বড় বড় করেছিল। কিছুটা আশ্চর্য হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম একটু দোরগোড়ায় দাঁড়ানোই ভাল হবে।

হয়তো আসবে না। আমার সঙ্গে হয়ত এতদিন তামাসা করেছে। অথবা কোন কাজে হয়ত জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু কি এমন কাজ থাকতে পারে। এত রাত্রে পুলিশে যদি ওকে পথে ধরে ফেলে থাকে! বুক ধড়ফড় করে উঠল। আবার বসলাম। জ্বালিয়ে খেল লোকটা! আমীরের ওপর খুব রাগ হল।

মনের আশঙ্কা কমানোর জন্য জানলা দিয়ে আকাশে যতগুলি তারা দেখা যায় সবগুলিকে গুণতে ইচ্ছে করল। এসব কথা কেন বলছি জান? এতক্ষণ প্রতীক্ষায় থাকলে তুমিও বুঝতে পারতে। তুমি বলবে তোমার অন্ধকাম তোমাকে এত নিচে নাবিয়েছে? কিন্তু প্রশ্ন: আজ এই যে জেলে যাচ্ছি আমি, কিসের জন্য? যৌন ক্ষুধার জন্য না ত্যাগের জন্য? ভালবাসার উত্তুঙ্গ শিখরে বসে আছে কয়েকটি পৌরাণিক পতিব্রতা নারী। তাদেরটাই কি ত্যাগ বলে স্বীকৃত হবে? আমি যে কত নিবিড়ভাবে ওকে চেয়েছি। আমি যে কত গভীরভাবে আমীরকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি—জানিয়েছি ভালবাসা। তার জন্য আমি যে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সুখ-দুঃখ সব ভুলেছি। এ সবকিছু কি তোমাদের চোখে যৌনক্ষুধা? আমীরের জন্য আমি যা করেছি ঐসব পতিব্রতারা কি শতকরা তার একভাগও

করেছে? তুমিই এসবের বিচার কর। তোমাকেই দিচ্ছি এর ভার। যাক্, যে কথা বলছিলাম।

অকারণে ফিক করে হাসলাম। আমার হারের হীরের সংখ্যা চারশো তিপান্ন কিনা গুণে দেখছি এমন সময় আমীর এল! ধপধপ করে পা ফেলতে ফেলতে এল। ইস একটু আস্তে হাঁটলে কি ক্ষতি ছিল? ভাবতে ভাবতে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর ভঙ্গিমায় দরজা খুললাম। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সাপটে ধরে দ্রুত দু পা এগিয়ে ঝুঁকে পড়ে হোঁচট খেয়ে বইয়ের আলমারীর উপর টপাস করে পড়ল আমাকে নিয়ে। বইয়ের আলমারীর কাচ ভেঙ্গে গেল। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে নিচে পড়লো কাচের টুকরোগুলো। সেই যে আলমারীর ওপরে পড়ে গেলাম—সেটা এমন কি ঘটনা ছিল! অথচ পরক্ষণেই আমরা দুজনে হো হো করে হেসে ফেললাম। কাচের টুকরো ভাঙ্গার আওয়াজের সঙ্গে আমার হাসি যেন সুর মিলাল। পরমুহূর্তে মনে হল বাড়ীর সবাই যেন উঠে পড়েছে। আমীরের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কত নিবিড়ভাবে যে সে আমাকে ধরে রেখেছে? মনে হল সবাই উঠে পড়েছে, সবাই শব্দের কারণ খুঁজছে। আলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু যেই আসুক, যে যাই করুক আমীর যেন মাথা নিচু করে নিজের ইচ্ছাপূরণের কাজেই ব্যস্ত। আমার মনে হল পৃথিবীতে এই একটি মাত্র লোক যে বিপদ কাকে বলে জানে না। বিপদ যেন তাকে দেখলে থমকে দাঁড়ায়—এগোতে সাহস পায় না। তার সাহস দেখে মাঝে মাঝে তার পায়ে প্রণাম করতে ইচ্ছে করত। আবার ইচ্ছে করত তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকটাকে চিরে ফেলি। কিছুক্ষণ পরে মুখোমুখি বসে কথা বলেছি।

একনাগারে ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যাচ্ছে। হিমেল হাওয়া বইছে। ব্যাঙগুলো ডাকছে। পথের ধারের আলো জানালা দিয়ে

ঘরে ঢুকে সেই আলমারীর উপর পড়ছে। আলো পড়ছে বইয়ে, খোদাই-করা সোনালী অক্ষরের উপর।

—কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?

—নিজাম।

—সেখানে গিয়ে...।

—কেউ কিছু বলবে না?

—জানতে পারলে তো! আর তাছাড়া সেখানে চলে যাওয়ার পর এখানকার কেউ জানলেই বা কি করবে!

—আর সেখানকার লোক...?

—সেখানকার কেউ আমাদের চেনে? আমরা নির্জন এক প্রান্তরে থাকব। তোমার কোন ভয় নেই।

সেই মুহূর্তে মন একটা প্রশ্ন করল. যাচ্ছিস কেন? জবাব দিয়েছিলাম, আমীরের সঙ্গে থাকতে। আবার মনে হল আমীরকে তো এখানেও পাচ্ছি। শুধু আমিই নই আমার মত অনেক রমণীই যে তাকে পাচ্ছে এখানে। ভালই তো চলছে। এই অবস্থায় ঘর-বাড়ি ছেড়ে ভ্রষ্টাদের খাতায় নাম লেখাব কেন? কিন্তু আমীর তো শুধু আমার যৌনক্ষুধা মেটানোর জন্য নয়। সে যে আমার মনের মানুষ! তার মুখ দেখলেই আমার সব তালগোল পাকিয়ে যায়। রান্না করা, ঘরসংসার দেখা আর একজন পুরুষের পাশে শোয়ার জন্য আমীরের সঙ্গ চাইছি না। আমীরের সঙ্গ চাইছি তাকে প্রাণভরে দেখতে। তার সঙ্গে সময়জ্ঞান না রেখে অনেক কথা বলতে, সর্বোপরি তাকে আমি এমনভাবে ভালবাসব যাতে পৃথিবীতে আর পাঁচজন ভালবাসতে শেখে। আমাকে একবারও, 'চলে এস' না বললেও আমি ওর সঙ্গে চলে যেতে চাইতাম। ওর সঙ্গে সুখদুঃখ ভাগ করে ভোগ করতে চাই। ওর সঙ্গে থাকার যে অনুমতি পেয়েছি তাতেই আমি খুশী। সে আমাকে যা ইচ্ছে তাই করুক।

আমাকে মেরে ফেলুক,—যা হয় হোক তবু আমি যাব ওর সঙ্গে। তার সঙ্গে আমার আলাপ অল্প দিনের হলেও ওকে আমার ঘর দোর উজাড় করে দিয়েছি। ওর উপর আমার যে বিশ্বাস; ওর প্রতি আমার যে ত্যাগ সবকিছু কি আমার উৎকট কামের জন্য? আমার মনের অনির্বচনীয় আনন্দলাভের ইচ্ছা শক্তির কি কোন মূল্য নেই?

॥ দুই ॥

সেখানে যাওয়ার প্রথম মুহূর্তেই আনন্দে মন ভরে গেল। উপরে স্নিগ্ধ নীল আকাশ, চারদিকে ঢেউখেলানো পাহাড়। নির্জন প্রান্তরে আমাদের ছোট্ট কুঁড়ে ঘর। সেখানকার বাতাস আর সেই পরিবেশে আমীরকে কাছে পেয়ে মন যে কত খুশী হয়ে উঠল তা ভাষায় বোঝাতে পারব না। কেমন লেগেছিল জান? ছেলেবেলায় বাড়িতে চাররকম রান্না করে সামনে রাখলে যেমন মনে হত কোনটা ফেলে কোনটা খাই, মন ব্যগ্র হয়ে উঠত সবগুলো একসঙ্গেই খেয়ে নেওয়ার জন্য। একটা খেতে না খেতেই মনে হত অন্যটার স্বাদ বুঝি বদলে যাচ্ছে—ওটা তাড়াতাড়ি না খেলেই নয়। ঠিক তেমনি লেগেছিল আমার সেই জায়গাটা। সবকিছুকে একসঙ্গে ভোগ করার প্রচণ্ড ইচ্ছা জাগল মনে। আমার বয়েস যেন অনেক কমে গেল। শিশুর মত হাসতে ইচ্ছা করল। শহর এবং আমাদের ঘরের মাঝে আছে একটি তেঁতুল গাছের ঘন বন। আমাদের ঐ ছোট্ট কুঁড়ে ঘরের আশে-পাশে কোন ঘর-বাড়ি নেই। যেদিকে তাকাই নীল আকাশ চুম্বন করছে পাহাড়কে! তারপর আরো নেবে এসে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমাদের কুঁড়ের আধ মাইলের

মধ্যেই একটা বিরাট বড় পাহাড়। আমাদের কুঁড়ের পাশেই আছে একটি ছোট্ট খরস্রোতা নদী। ঐ নদীর দিকে তাকালে মনে পড়ত আমার মার কথা। মাও ঠিক তেমনি বাড়ির কাজে ব্যস্ত থাকত। সেখানকার আকাশ সবসময় যেন নীল আবরণে ঢাকা। বৃষ্টি পড়লে আরো মজা। পাহাড়গুলোকে, সবুজ প্রান্তরকে মনের মত সে যেন স্নান করিয়ে যায়। সেই বৃষ্টির জলে আমাদের এই ছোট্ট নদীর জল কানায় কানায় ভরে যায়। সুন্দর দেখায়। ঠিক যেন গর্ভবতী তন্বী আর মাস কয়েক পরে মা হবে। আর পাহাড়গুলোর গা যেন ঢেকে দেয় তুলোর মত হালকা সাদা মেঘ।

প্রথম প্রথম সেই ছোট্ট কুঁড়ে ঘরের মধ্যে থাকা, রান্না করা, বিনা তরকারীতে খাওয়া এবং সাধারণ একটা মাদুর পেতে ঘুমাতে কষ্ট হত। রান্না করার সময় স্বামীর এলে সবকিছু ফেলে রেখে বেরিয়ে যেতাম। ভাত না খাওয়ার বায়না ধরতাম। কিন্তু জান, গভীর ভালবাসা থাকলে ত্যাগ কত সহজ হয়ে যায়। ত্যাগের জন্য মিছেমিছি পতিব্রতাদের প্রশংসা করা হয়। ভালবাসা থাকলে প্রতি মুহূর্তে সস্তা আনন্দ, সুখ, ব্যক্তিগত প্রয়োজন তুচ্ছ মনে হয়। সব সময় মন ব্যস্ত থাকে ভালবাসাকে গভীরতর করার জন্য।

স্বামীর ঘর করার সময় বিয়ের পর ক'দিন উনি আমাকে খুব ভালবেসেছিলেন। অনেকদিন আগে ওঁর এক বিলেত ফেরৎ বন্ধু আমাদের বাড়িতে এসেছিল খাওয়া-দাওয়া করতে। আমি পরিবেশন করতে পারব না বলেছিলাম। কারণ কি জান? আমার বড় মাসী এসব পছন্দ করে না। তার মতে পুরুষ মানুষ অনেক কিছুই নির্বিকারভাবে করতে চায়। কিন্তু মেয়েমানুষের উচিত ভেবেচিন্তে কাজ করা। ঠাকুরঝি আমার হাত ধরে টানাটানি করল। উনিও খোসামোদ করেছিলেন। শেষপর্যন্ত ওঁকে অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হল। পরে উনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ওঁর

প্রতি আমার ভালবাসা আছে কিনা, তাই যদি থাকে তাহলে আমি ওঁর কথা শুনছি না কেন। পাথরের মত দাঁড়িয়েছিলাম। হাঁ-না করিনি। তারপর আশ্চর্য, সেদিন মামু আমাদের ঐ কুঁড়ে ঘরে এসে বললেন, শেষ পর্যন্ত তুমি মুসলমানের ছোঁয়া ভাত খেলে। সেদিন কিন্তু একটুও মনে দ্বিধা বা সঙ্কোচ জাগেনি। বলেছিলাম, মুসলমানের ছোঁয়া ভাত। কি করে বলব ওধরণের কথা। আমীর যখন মাঝে মাঝে আদর করে আমার মুখে ভাত পুরে দেয় আমার যে তখন কিছুই মনে থাকে না। সেটা যে অমৃত মনে হয়! এমন কি অনেক দিন তরকারীতে নুন-ঝাল কম পড়লেও টের পেতাম না। চাটনীতে বালি পড়েছে বলে, ভাতে কাঁকর আছে বলে, ডাল ভাল গলেনি বলে, ভাতের থালা ছুড়ে দিয়ে কর্তারা উঠে পড়ে। কিন্তু আমীর তা করেনি। আমরা যে প্রাণের টানে বাঁধা পড়েছিলাম। সেখানে নুন-ডাল-তেলের জন্য ঝগড়া হয়নি। ভাতের ফেনই তো যথেষ্ট। অনেকে এই ধরণের ভালবাসাবাসিকে প্রেম বললেও আমার মামুর মতো পণ্ডিতেরা ওটাকে বলে পশু-জীবন। তার কারণ ওদের মতে এসবে নাকি অনেকে মনে ব্যথা পাবে। আমার ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে অনেক বাড়ির বউ এবং মেয়েরা নাকি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে উচ্ছন্নে যাবে।

আমাদের দিনগুলো সেখানে কাটতো কি ভাবে? তাহলে শোন। সকালে সূর্যের সোনালী আলো আমাদের সারা দেহে পড়ত। তারপর একটু মাথা তুলে একে অন্যের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। তারপর রাত্রের ব্যাপার মনে পড়তেই আমরা দুজনেই লজ্জা পেতাম। ঘুম ভাঙা সকালের সৌন্দর্য দেখে মন আনন্দে ভরে যেত। সকালের পাখির গান, সুবিস্তীর্ণ সবুজ ক্ষেত—সবকিছুই যেন আমাদের আনন্দকে বাড়ানোর জন্য। আমাদের সতেজ-সুন্দর করে তোলার জন্যই যেন প্রকৃতি নতুন

পোষাকে আমাদের চারিদিকে দাঁড়িয়েছিল। সকালে কফি খাওয়ার পাট ছিল না। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। আগে কফি খেতে একঘণ্টা দেরী হলে মেজাজ বিগড়ে যেত। কাজে মন বসত না। সেখানে যাওয়ার প্রথম দিন থেকেই কফির কথা ভুলে গেছি। সকাল-সকাল দু-মুঠো ভাত ফুটিয়ে নিতাম। আমীর তেঁতুলগাছের ডাল কুড়িয়ে আনত। ওতেই ভাত ফুটে যেত। আমাদের কুঁড়ে-ঘরের পেছনেই একটি বড় পাথর পড়েছিল। তাতে পেঁয়াজ-লঙ্কা-তেঁতুল বেটে নিয়ে চাটনী বানিয়ে ভাত খেয়ে নিতাম। সেই ছিল আমাদের রান্না। কালে-ভদ্রে দু'চার পয়সার ঘোল কিনতাম।

আমীর পায়রা নিয়ে খেলা করত। মজা করে মাঝে-মাঝে আমি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বলতাম, কই গো, ওঠ—রান্না হয়ে গেল যে, খাবে এস। ঠিক আমার স্বামীর সঙ্গে এইভাবেই সমাহ করে কথা বলতাম। আমীর আমার ডাক শুনে তৎক্ষণাৎ গুরু-গম্ভীর গলায় আমার বামুন-উকিলবাবুর মতই বলত, এই যে উঠেছি ...একটা ফাইল একটু দেখে নি। এই ধরণের রসিকতা প্রায়ই হত। একবার আমীর ভুলে গিয়ে বলেছিল, এই যে উঠছি—এই কবুতরগুলোকে একটু—। পরক্ষণেই সে কী হাসির ফোয়ারা।

একদিন আমীর মুখ ভার করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, কোর্টে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, এখনও রান্না হয়নি ?

—হবে কি করে, আজকে পূজো, সেকথা কি ভুলে গেছ।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমীর যেন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সরে যাওয়ার চেষ্টা করেও পারিনি। সাপটে ধরে আমার কাঁধের ওপরেই কামড়ে দিয়েছিল। আমি বললাম, ইস্ কি করলে বল দেখি। ঐ দেখ তোমার কপালের এই জায়গাটা কি রকম ফুলে গেছে। এইভাবে কামড়াও কেন ? কী বিশ্রী অভ্যেস !

আমরা ছিলাম ওই কুঁড়ে ঘরে। বাসন-কোসন তেমন কিছু ছিল না। সাজগোজও না। যাদের কাছে শরীর বড় কথা নয়, যারা সৌন্দর্যকে দূরে রেখে আনন্দ পেতে চায়, প্রেম যাদের কাছে স্বর্গীয় তারা অবশ্য আমাদের মত জীবন যাপন করতে পারবে না। যারা দর্শনের বুলি আওড়ায়, বারমাসে তের পার্বন করে আর তিরিশ বছরেই বুড়িয়ে যায় তারা এই ধরণের জীবনযাপনের তাৎপর্য বুঝবে না। আমীর যখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠত, আমাকে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরত যে গা-হাত-পা ব্যথা হয়ে যেত।

তারপর আমাদের স্নানের কথা বলি। দিনে কত ঘণ্টা যে ওই নদীতে কাটাতাম তার হিসেব রাখিনি। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই। এমন কি অন্ধকারেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্নান করতে ভয় পেতাম না। কী চমৎকার লাগত। রোদে বালি চিক্‌চিক্ করত।

একগলা-যৌবন নিয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কাটতাম। বালির ওপরে শুয়ে পড়তাম। ছোট ছোট ঢেউ আমাদের ছুঁয়ে আবার ফিরে যেত। জল আমাদের দুজনকে টানত। নদীর জলও যেন আমাদের বন্ধু।

একদিন অন্ধকারে আমীরকে বলেছিলাম, জান আমীর, এই জল যেমন আমাদের টানছে ঠিক তেমনি আমাকেও টেনে একদিন বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়েছিল। আমীর কোন জবাব দিল না। আমার মনে হল আমীর হাসছে। আমার সে-ধারণা ভুল। পরক্ষণেই আমীর গর্জে বলল, কারা তারা?

আশ্চর্য হয়ে তার দিকে ঘুরে বললাম, কারা মানে?—তাদের নাম বল। আমি এক্ষুণি জানতে চাই তাদের নাম।

তৎক্ষণাৎ আমীরের গলা জড়িয়ে ধরে বললাম, কেন আমীর, কিসের জন্য তোমার এত রাগ?

—জানতে চাই।

—ওদের নাম ?

—হ্যাঁ।

হাসলাম। আমার মুখ লুকিয়ে আছে আমীরের প্রশস্ত বুকে।

রাগে গজগজ করতে করতে আমীর বলল, আমি—আমি—জানতে চাই—কারা —কেন···

আরো কি সব যেন বলছিল আমীর। আমি শুনতে পাইনি। তারপর আমীর বলল, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না...কোনদিন যেও না তোমার ঐ বামুন-উকিল স্বামীর কাছে !

আমি ফিক করে হেসে ফেললাম। ওর কথা আমীরের মুখে শুনে শুধু যে রাগ হয়েছে তা নয়, মনে হল যেন সে পূর্ব জন্মের কারো কথা বলছে। বললাম, আমীর ও-কথা তুমি বল না। ও-নরকে আমি যাব কেন ? তুমি আমাকে পাঁক থেকে তুলে এনেছে। তারপর আমরা পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরতাম। অনেকক্ষণ।

বল দেখি এই স্থান কত সুন্দর। স্বর্গ যদি কোথাও থাকে—সেখানকার পুরুষ এবং নারীর স্থান কি এর চেয়ে ভাল হয় ? স্বর্গের কথা বললেই আমীর চটে যেত। আমীরের মতে আমরা যেখানে ছিলাম সেটাই স্বর্গ। আমাদের স্বর্গই সত্য আর সব মিথ্যা। মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলত, যেতে চাও তোমাকে আমাদের মুসলমানী স্বর্গে নিয়ে যাব !

—আমি যদি আগে মরি ? আমীর বললে।

—আগে আমি মরব।

আমীর কান খাড়া করে রইল। আরও যেন কিছু শুনতে চায়। কিছুক্ষণ পরে বলল, আমি আগে মরব মানে। আমি যাব কোথায় ?

ওর মুখ দেখে বুঝলাম বেচারা কষ্ট পেয়েছে। বললাম, না-গো-

না আমি তোমার জন্যই মরব—আর বাঁচি তো তোমার জন্যেই বাঁচব।

স্নানের সময় এই ধরণের কথা হত। যতক্ষণ না শরীর অবশ হয়ে যায়—কখনো ভেসে কখনো ডুবে সাঁতার কাটতাম। আমীর আমাকে সাঁতার শিখিয়েছিল। আমি যখন দূরে জলে দাঁড়িয়ে থাকতাম, ডুব-সাঁতার দিয়ে এসে আমার পা ধরে টেনে নিয়ে যেত অনেকদূরে। আমরা দুজনে ডুবতে ডুবতে কালো বালিতে ঠেকতাম? ইচ্ছে করত সেখানেই থাকি।

তারপর বালিয়াড়ির উপর আমরা দুজনে বসতাম। বাতাস যদি আমার সমস্ত শরীর ছুঁয়ে যায়, আলোক যদি যায় শরীরের যত্রতত্র, তা'হলে আমীরের সে-স্বাধীনতা থাকবে না কেন! তার সামনে আমার লজ্জা কিসের। আমীর আমার সৌন্দর্যকে আকণ্ঠ পান করত।

স্নানের পর খাওয়া। মুখোমুখি দুজনে বসতাম। খাওয়ার আগে চোখ দিয়ে পরস্পরকে গিলতাম। ভাত আর ক'টা খেতাম। কী খেতাম—কেমন লাগত কিছুই মনে নেই। আর স্বামীর ঘর করার সময় চার রকম তরকারী, ঘি ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও ভাত খেতে পারতাম না। ভাললাগতো না কিছু।

দুপুরে তেঁতুল গাছের নিচে মাদুর পেতে ঘুমোতাম। কোনদিন কি তোমার সে সুযোগ হয়েছে, মাটির উপরে শুয়ে অপলকদৃষ্টিতে নীলাকাশের দিকে তাকানোর? কী সুন্দর লাগত মাঝে মাঝে আমাদের গায়ে ছোট ছোট ফুলের মত ঝরে পড়ত তেঁতুলপাতা। মধ্যাহ্নের দু-একটি পাখি আকাশের বুক চিরে ডাকত। বেশ লাগত তাদের ডাক।

রাত্রি। চারদিকে নিস্তব্ধ। অন্ধকারে-জ্যোৎস্নায় আবার দু-মুঠো ভাত ফোটাতাম। হাঁড়ির কাছে দুজনে বসে থাকতাম। সেই

অন্ধকার রাত্রে আগুনের শিখাগুলো চমৎকার দেখাত। মাঝে মাঝে তুপুরে আমীর নদীতে মাছ ধরত।

তীরে মাছগুলো ছটফট করত। মাছের কানকো বেয়ে রক্ত ঝরত। আমি পারতাম না সে দৃশ্য দেখতে। তার অজ্ঞাস্তে তু'একটি মাছ আবার জলে ছেড়ে দিতাম। জিজ্ঞেস করলে বলতাম, ছেড়ে দিয়েছি। কারণ শুনে সে হো-হো করে হাসত। স্নানের সময় ঐ মাছগুলো যেন আমাদের গায়ে চুমো খেত। আমি বলতাম, দেখলে তো কী সুন্দর মাছ—ওদের মেরে ফেলতে কি ইচ্ছে করে? পাপ হবে না?

—পাপ আবার কিসের? ভগবান নিজেই তো প্রতি মুহূর্তে জগৎটাকে একটু একটু করে মেরে ফেলছেন।

—তাহলে এবার থেকে তুমি মানুষ খেতে সুরু করে দাও।

—জগতে কিছু লোক নিশ্চয়ই মানুষ খায়।

মাছ আমি রাঁধতাম না, সেই-ই রাঁধত। গন্ধও আমার সহ্য হত না। আমার এ-অবস্থা দেখে সে নিজেও মাছ ছেড়ে দিয়েছিল। অথচ আশ্চর্য আমার স্বামীকে কতবার অনুরোধ করেও নস্যি ছাড়াতে পারলাম না। যেদিন আমীর মাছ খেত আমি বলতাম, আমীর তোমার মুখে মাছের গন্ধ, কাছে এস না। সেদিন সারারাত আমীর আমার কাছে ঘেঁষত না। দূরে শুয়ে ঘুমে চোখ বুজে আসা পর্যন্ত আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। শেষ পর্যন্ত আমিই আর থাকতে পারতাম না। ওকে কাছে টেনে নিতাম। পরক্ষণেই অবশ্য আমার হয়ে যেত। কিন্তু কি করব কাছে না টেনে পারি না—আমি তো দেবী নই—মানবী।

শোওয়ার সময় গায়ে কাপড় রাখতে দিত না। সারারাত আমার নগ্ন দেহটিকে জড়িয়ে রাখত নিজের দেহের সঙ্গে।

মাঝে মাঝে মনে হত আমাকে যেন সে ছিঁড়ে খাবে। গাল

চুমোয় চুমোয় ভরে দিত। এত জোরে জড়িয়ে রাখত যে দম নিতে কষ্ট হত। ঘাম ঝরত—আমাকে যেন সে নিজের শরীরের সঙ্গে এক করে রাখতে চায়।

মা বাবা স্বামী বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কিছুই তখন মনে পড়ত না। সত্য মনে হত আমার আমীরকে, সত্য মনে হত চারদিকের ওই সুন্দর কালো পাহাড়, ওপরের ওই আকাশ, অদূরের ওই নদী আর বালিয়াড়ী এবং আমাদের ছোট্ট কুঁড়ে ঘর—এছাড়া পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই মনে হত মিথ্যা।

॥ তিন ॥

কতদিন হল, কত হপ্তা কেটে গেল, কত মাস যে পেছনে ফেলেছি কিছুই টের পাইনি। এমন কি কোন্ দিন কোন্ বার তাও জানতাম না। নিজেদের মধ্যে নিজেরা ডুবে ছিলাম।

হঠাৎ জানতে পারলাম মামার কাছে। সেদিন সন্ধ্যায় আমরা দুজনে মিলে রান্না করছি। মামু এল আমাদের খোঁজ করতে করতে। মামুর গায়ে চিরাচরিত সাধারণ পোষাক। তাকে দেখেই আমীর তেলে বেগুণে চটে গেল। উর্দু ভাষায় বলল, যাও, যাও এখান থেকে। মামু ভয়ে-ভয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না তার করুণ অবস্থা দেখে। আমীরকে বললাম, আমীর ওকি করছ? উনি যে আমার মামু।

কেন জানিনা মামুকে দেখে আমার একটুও ভয় করেনি। আমীরের চোখে মুখে কেমন একটা অস্বস্তিকর ভাব।

—মামু! তোমার মামু? এখানে এল কি করে? কেন এসেছে?

—জিজ্ঞাসা পরে করব। এসেছে, আগে বসতে বলি। মামু বস। তারপর গলার স্বর বদলে আমীরের দিকে তাকিয়ে বললাম, আচ্ছা তুমি কি! আমার বাপের বাড়ির লোক আসলে কি তুমি তাদের সঙ্গে এই ধরণের ব্যবহার করবে? এই কি তোমার ভদ্রতা। তারপর আবার মামুর দিকে ফিরে বললাম, হঠাৎ কি মনে করে? বাড়ির সব ভাল ত?

—আর যাই হোক তোমার তাতে কি এসে যায়? তুমি তো এখানে বেশ সুখেই আছ। তারপর মামু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরের দেয়াল দেখল।

—মামু ওসব ভূমিকা না করে আসল কথাটা বলত।

আমার কথায় ঢং আর সাহস দেখে মামু স্তম্ভিত হয়ে গেল।

—সত্যি তুমি কত বদলে গেলে।

—অন্ধকূপ থেকে আলোতে এসেছি, মরতে মরতে বেঁচে গেছি তাতেও কি আমার পরিবর্তন হবে না?

—তুমি এত নীচে নাবতে পারলে! মুসলমানদের ছোঁয়া ভাত খেলে!

—আমার বাড়িতে এসে মুসলমান তুলে কথা বললে মুসলমানী চাটি খাবে কিন্তু। মান-সম্মান কি সব বাড়িতে ফেলে রেখে এসেছ? আমীর চোখ রাঙিয়ে বলল। মামু ওর কথা শুনে থ বনে গেল। তার চোখ ফেটে জল আসছে। আমার দিকে অসহায়ভাবে তাকাল। আমার গায়ে জামা নেই। চুল বাঁধিনি। পরনে একটি মোটা শাড়ি। আমার পাশে উনানে ভাতের হাঁড়ি।

—দেখ তোমার মামু কিন্তু এখানে বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। কখন কেঁদে, কখন চিৎকার করে আর রাগ দেখিয়ে তোমাকে ছলে-বলে-কৌশলে এখান থেকে নিয়ে যেতে চায়। ভাল চায় তো সে যেন তাড়াতাড়ি সরে পড়ে এখান থেকে। তা নাহলে কিন্তু।

তুমি এক কাজ করত, একটু ঘুরে এস। তুমি এখানে থাকলে দেখছি আসল ব্যাপার জানতে পারব না। কই যাও না। যা বলছি তা না শুনলে কিন্তু…

—যাচ্ছি কিন্তু কথাগুলো তাড়াতাড়ি সেরে নেবে। আমার বেজায় খিদে পেয়েছে। আমীর চলে গেল।

—তারপর মামু, আমি যে এখানে আছি তা জানতে পারলে কি করে?

—যে করেই হোক জেনেছি। এখন তোমার ব্যাপার জানতে চাই। একি হচ্ছে তোমার!

—আমার ব্যাপার বলার আর কি আছে। সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাণীর মত আছি এখানে।

—তাই নাকি! মামু চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকাল। আমার হাবভাবে কোনরকম পরিবর্তন না দেখে দৃষ্টি নামিয়ে বলল, খুব বেড়ে গেছ না? আমাদের কথা না হয় বাদ দিলাম কিন্তু তোমার মার কথা কি একবারও ভেবেছ? শুধু নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকটাই কি বড় হল? এ ধরণের কাজ করলে আমাদের সকলের মাথাই যে লজ্জায় হেঁট হয়ে যায় তা কি একবারও ভেবে দেখলে না?

—আচ্ছা মামু, তুমি কি! এলেই যখন একটু ভদ্রভাবে সেজেগুজে আসতে পারলে না! সেই আদ্দি কালের রেলের একটা জামা পরে এলে! আমীরের কাছে তোমাকে মামু বলে পরিচয় দিতে আমার কত লজ্জা করল জান? একবারও ভেবে দেখলে না যে ঐ কুৎসিত চেহারার সঙ্গে এই পোষাকটা কী বিশ্রী রকমের বেমানান।

—কি বকছ আজে-বাজে কথা। তোমার ঘাড়ে কি ভূত চেপেছে?

—না। ভূত চাপেনি। আচ্ছা মামু, তোমাকে একটা প্রশ্ন

করি। তোমরা জীবনে যা কিছু করেছ সে-সব কি আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মনে ব্যথা না দেওয়ার কথা মনে রেখেই করেছ? একবার ভেবে দেখ দিকি ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত তোমার নিজের মায়ের মনে কতবার ব্যথা দিয়েছ। কী, জবাব দাও? থাক। ওসব এখন তোমার মনে পড়বে না!

—ওসবের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক? আর যাই করি আমরা অন্তত কোন মুসলমান…

—তা জানি মামু। তোমরা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের যেভাবে কাঁদিয়েছ তা সমাজ অনেকদিন আগেই মেনে নিয়েছে। সমাজের চোখে ওসব অমর্যাদাকর নয়! আর আমি যা করেছি এখন তোমরা মেনে নিতে পারবে না। যাক ওসব কথা। তুমি কেন এলে এখানে তাই তাড়াতাড়ি জানাও। আমীর আবার আমাকে ছেড়ে পাঁচ মিনিটও থাকতে পারে না।

মামু কয়েক মুহূর্ত রক্তচক্ষু করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। দাঁতে দাঁত ঘষল। আমি যেন অল্প বয়সী একটি মেয়ে। যা মুখে এসেছে তাই বলেছি বলে আমাকে চোখ রাঙিয়ে শাসন করছে। কিন্তু এখন ওসব অকেজো। আমি ফিক্ করে হেসে ফেললাম। মামু আরও জ্বলে উঠল। রাবণের দিকে নিক্ষিপ্ত তীরগুলো ব্যর্থ হলে যেমন রাম বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল ঠিক তেমনি সে চটে চিৎকার করে বলল, একটুও লজ্জা করছে না এসব কথা বলতে? এত নিচে নেবে গেছ? ঐ মুসলমানের বাচ্চা যে তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না—একথাও ফলাও করে বলছ?

—মেয়েদের জীবনে এর চেয়ে বড় চাওয়া আর কি থাকতে পারে? অবশ্য ওসব তুমি বুঝবে না। আবার দাঁত কটমট করে মামু বলল, বুঝব কি করে! মানুষ হয়ে জন্মেও শেয়াল-কুকুরের মত যার তার সঙ্গে …।

মামু অনেক কথাই বলল। আমি তো কত নিচে নেবে গেছি, তবু মামুর ঐ কথাগুলো আমার মুখ দিয়ে বেরোবে না।

—পাপ-পুণ্য লজ্জা-ভয় সবকিছুই দেখছি জলাঞ্জলি দিয়ে এই বন-বাদাড়ে দিন কাটানো হচ্ছে। এভাবে বাঁচার কী দরকার। এর চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরলেইতো পার।

—দেখ মামু, বিয়ের পর হপ্তাখানেক আমার উনি অর্থাৎ তোমাদের উকিলবাবুও আমাকে নিয়ে এইভাবেই মজে ছিলেন। তারপর কেমন যেন দমে গেলেন। আমার উপর টান কমে গেল। ব্রহ্মচারীর মত দিন কাটাতে লাগলেন। কই তোমরা তো তাকে কোন উপদেশ দিলে না।

—সেই পবিত্র জীবনের সঙ্গে এ-পঙ্কিল জীবনের তুলনা করতে এসেছ? ছি, পারলে কি করে!

—যাই বল মামু, তোমার সেই পবিত্র জীবনের চেয়ে আমার আজকের জীবন ঢের ভাল লাগছে।

—তা লাগবে না কেন! জাত-মান, কুল-গোত্র কোন কিছুই তো নেই…।

—সত্যিই তাই। ওসব বাঁধন থেকে যত মুক্ত থাকা যায় ততই ভাল। ওসব আমার কাছে অসহ্য।

—অসহ্যতো লাগবেই। দুর্বুদ্ধি আর কাকে বলে!

—আমার এই দুর্বুদ্ধির জন্য তোমরাই তো দায়ী। দেখ মামু, আমার ঘটে যেটুকু বুদ্ধি আছে তোমরা কান্নাকাটি করে আর একটুও বাড়াতে পারবে না।

—পিঠে দুটো পড়লে সব ভূত পালাবে।

—বড্ড দেরী হয়ে গেছে মামু। যাক এভাবে আজেবাজে কথা বলে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।

—মানে! কি বলতে চাও তুমি?

—বলতে চাই পবিত্রত্য, নীতি, পাতিব্রত—এসব কথার এক ধরণের অর্থ হাজার বছর ধরে বহাল আছে। ওসব কথার তাৎপর্য কি বা কেন সে-সম্পর্কে মানুষ চিন্তা করা বাদ দিয়েছে। আসল কথা কি জান, সব মানুষের মধ্যেই কামনা-বাসনা আছে, মুসলমানই হোক আর ব্রাহ্মণই হোক। এখানে আমি আমার মনের মত জীবন-যাপন করতে পারছি। আর ওখানে কখন আধ্যাত্মিকতা এসে আমার গলা টিপবে, কখন অন্ধ-সংস্কার আমার কান মলে দেবে! আর আমাকে ওসবের ভয়ে নিজের ইচ্ছাগুলিকে টুঁটি টিপে মারতে হবে। অবশ্য তোমাদের ওখানেও যে তলে তলে অনেক কিছুই হয় না তা নয়। হয় বলেই মাঝে মাঝে তোমাদের কোর্টে ছুটতে হয়। অস্বীকার করতে পারবে না নিশ্চয়।

—তোমার মতে মন যা চায় তাই করা উচিত। ভোগটাই বড় হল! সেইটাই জীবনের সবচেয়ে বড়?

—আর সেখানে থেকে কি হয়? খাওয়া, ঘুম আর রান্না এই ত? এর চেয়ে কি নতুন কিছু।

—তাহলে ধর্ম, পাতিব্রত্য, ঘর-সংসার এসব কিছু।

—কে চায় মামু ওসব। মনে মনে কেউ চায় না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মার খাওয়ার ভয়ে, খেতে দেবেনা ভেবে, অন্য কোন উপায় না থাকায় মেয়েরা স্বামীদের আঁকড়ে পড়ে থাকে চাকরাণীর মত। পারস্পরিক টান যেখানে নেই সেখানে কিসের পাতিব্রত্য! স্বামীর লাথি খেয়ে সারাজীবন তার মন জুগিয়ে চললেই কি পাতিব্রত্য রক্ষিত হয়?

—মেয়েদের জীবনে এসব হলো ত্যাগ। তুমি কি বলতে চাও ত্যাগের কোন মূল্য নেই?

—আমীরের জন্য আমি যা ত্যাগ করেছি।

—থাক। এখন বুঝলাম যে পশুর সঙ্গে তোমার কোন পার্থক্য নেই।

—সত্যিই নেই। এতদিন পশুর চেয়েও অধম জীবনযাপন করতাম। আর এখন…

—আর তোমার মা, তোমার স্বামী…

—শ্বশুরবাড়িতে যে কটা দিন ছিলাম—মন যেদিন কেঁদে উঠত, গোপনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতাম—যখন, তখন মনে পড়ত মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব। কিন্তু এখানে এতদিন ধরে আছি সত্যি বলছি মামু, ওদের কথা একবারও মনে পড়েনি। আমার জীবনে সত্যিকারের শ্বশুরবাড়ি তো এইটেই! এইটেই আমার স্বর্গ। আমি সব কিছুকে ভুলে আছি আমার আমীরের সঙ্গে।

—তাহলে এখানেই চিরকাল পড়ে থাকবে! ফিরবে না বলছ?

—আমাকে কি আমীর ফিরতে দেবে? আমি কি ঠাঁই পাব তোমাদের সমাজে?

—ঠাঁই পেলে ফিরবে?

—কেন ফিরব? আমার কি দায় ঠেকেছে ফেরার।

—এ জীবন তোমার কাছে ভাল লাগছে! এই হাঁড়ি, এই ছোট্ট কুঁড়ে ঘর, একটা আরশিও তো নেই যে চুল বাঁধবে।

—কেন বাজে বকছ? নাই বা রইল আরশি, ঐ নদীর জলে কি মুখ দেখতে পাব না। আমীরের চোখেও তো দেখতে পাই নিজেকে। নিজেকে দেখার কি দরকার? আমীরের চোখে আমি ভাল লাগলেই তো হলো।

মামু নীরবে বসে রইল। আমীর ফিরে এল।

—এখনই চলে এলে কেন? এখনও তো আমাদের ভূমিকা হচ্ছে। আমীর বেচারা আবার চলে গেল।

—দেখলে তো? এক মুহূর্ত সে আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। আর আমার স্বামী দশ-বার-দিন পর্যন্ত আমার মুখ দেখার প্রয়োজন বোধ করত না। সেজেগুজে সামনে দাঁড়ালেও মাথা

গুঁজে ফাইলপত্তরে ডুবে থাকত। প্রায় শুনতে হত, কই পরশুদিন যে তোমাকে দশটাকার নোট দিয়েছি সেটা দাও তো? আমি ফেরৎ দিতাম।

—আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি তোমার কথা শুনে! নিজের স্বামীর নিন্দে গাইতে লজ্জা করছে না। তা ছাড়া তোমার জানা উচিত যে উকীলমশাই ইচ্ছে করলে একদিনে তোমার এই লোফারটাকে জেলে পাঠাতে পারেন।

—জান মামু, এই লোফারটা আবার যদি ইচ্ছে করে তাহলে একসঙ্গে ওঁর এবং তোমার মাথা ফাটিয়ে এইখানেই পুঁতে রাখতে পারে।

—তাহলে তুমি এখান থেকে ফিরবে না! আমি আগেই আঁচ করেছিলাম। তবু ওরা আমাকে খোশামোদ করে পাঠাল। এখনও ব্যাপারটা জানাজানি হয় নি তাই…।

—তাহলে আমার সম্পর্কে তোমরা কি প্রচার করেছ?

—উকীলবাবু লোকের কাছে বলছেন, বউ বাপের বাড়ি গেছে, অসুস্থ।

—সবাই একথা বিশ্বাস করছে?

—ব্যাপারটা ভেতরে ভেতরে কিছু লোক জানে তবে প্রকাশ্যে মুখের উপরে কেউ কিছু বলতে সাহস করছে না। আমাদের সামনে এমন ভাব করে যেন ওরা প্রত্যেকটি কথাই বিশ্বাস করছে। তোমাকে খাইয়ে-পরিয়ে যারা এত বড় করেছে তাদের যে তুমি কোন্ অবস্থায় ফেলেছ এখন বুঝতে পারলে তো?

—বেচারা ভদ্রলোকদের কী দুরবস্থা! তোমাদের মেকী সম্মান আর মিথ্যা আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য আমাকে আবার ঐ নরকে গিয়ে বাস করতে হবে! কেন যাব বলতে পার?

—কেন আবার কি? না বুঝে একবার ভুল করে বসেছ।

ভুল কি আর মানুষ করে না? কিন্তু পরে শুধরেও যায়। কিন্তু একবার যে ভুল পথে পা রেখেছে সে-পথ আর ছাড়ে না এমন লোক আমি দেখিনি। আজ প্রথম তোমাকে দেখছি।

—তা অবশ্য ঠিক। যাক, শোন আমি যাব না। এই আমার শেষ কথা।

—আজ তুমি এই ধরণের কথাই বলবে। এইভাবে তো আর চিরকাল কাটবে না। এ লোকটা আর ক'দিন তোমাকে এভাবে রাখবে। কিন্তু তারপরের কথা কি একবার ভেবে দেখেছ?

—তখন ঈশ্বর আছেন। কিন্তু আমি জানি আমীরের ভালবাসা অত ঠুনকো নয়।

—ওসব অনেক দেখেছি।

—আচ্ছা আমার জন্য তোমরা অত চিন্তিত কেন? এত দয়া দেখাচ্ছ কেন?

—তোমার মায়ের কথা একবার ভেবে দেখ। তোমাকে জন্ম দিয়ে কোলেপিঠে মানুষ করেছে কিসের জন্য। যাতে তুমি ওদের সুনাম বজায় রাখ—এই জন্যই ত?

—বাচ্চা বয়সে উপদেশমালায় পড়েছি ওসব, এখন তুলে রাখ। তোমরা যদি সত্যিই আমার সুখ চাও তাহলে এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাঁকপাঁক কর না। আচ্ছা মামু, একবারও কি ভেবে দেখেছ, আমি যদি এখন ফিরেই যাই তাহলে লোকে আমাকে কিভাবে গ্রহণ করবে? আর যার সঙ্গে ঘর করব সেই বা কি রকম ব্যবহার করবে? ভেগে-যাওয়া মেয়েকে দেখার জন্য লোকে ভিড় করবে। অথচ ওদের চোখেমুখে ঐ ধরণের কোন কৌতূহল প্রকাশ পাবে না। কিন্তু মনে মনে আমাকে দেখে ওরা সবাই হাসবে। স্বামীর ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে সবাই মুখ টিপে টিপে হাসবে। এসব

মেকী-ভদ্রতা আমার ভাল লাগে না। তাছাড়া আত্মীয়স্বজনের বিয়েতে অন্নপ্রাশনে-শ্রাদ্ধে আমাকে নেমন্তন্ন করবে না। ওঁকেও হয়ত করবে না। ওঁর আবার মনে পড়বে আমার কীর্তিকাহিনী। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন কাটানোর জন্যই তো আমাকে নিয়ে যেতে চাইছ?

—আজ না হোক দুদিন পরে ও-বাড়িতে না উঠে তোমার উপায় থাকবে না।

—আমীর আমাকে ছাড়লে তো? আর আমীর যদি ছেড়েই দেয় তো এ জীবনের আর প্রয়োজনটা কি? তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো কোনদিন তোমাদের বাড়ির ত্রিসীমানা মাড়াব না।

আমীর আবার এল। ওর দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ভাবলাম, একি কোনদিন আমাকে ছেড়ে দেবে? আমীরের চোখে-মুখে ক্ষুধার চিহ্ন।

—মামু, তোমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার কি হবে?

—আমি ফল এনেছি।

—এখানে ঘাষও আছে। আমীর বলল।

পশ্চিম দিগন্তের পাহাড়ের ওপারে সূর্য হারিয়ে যাচ্ছে। স্নিগ্ধ গোধূলি বেলা। অদূরের ঝর্ণার শব্দ ভেসে আসছে। অন্ধকার নেবে আসছে তার ডানা মেলে মাটির বুকে। মন আমার আনন্দে পরিপূর্ণ। নেহাৎ মামু সামনে বসে ফল খাচ্ছে তা না হলে আমীরকে দিতাম আমার সেই আনন্দের ভাগ।

আরও ঘণ্টাখানেক মামুর সঙ্গে কথা বললাম। দু'চারজন আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের খবর জানলাম। মামুর কাছ থেকে যা শুনেছি তাতে বুঝলাম যে তিন মাস আগেও যারা আমার ঘনিষ্ট বান্ধবী ছিল এখন আমার প্রতি তাদের মনোভাব বদলে গেছে। আমি আর একবার অনুভব করলাম, আমি আর সেই

আগের আমি নেই। আমার পুনর্জন্ম ঘটেছে। এ-জগতে আত্মীয়-স্বজন ঘরসংসার সমস্ত কিছুর কথা নতুন করে মনে পড়ছে। এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমীরের দিকে চোখ পড়ল। তারপর খেই হারিয়ে গেল।

দাদার একটি ছেলে হয়েছে শুনেও মনে একটুও আনন্দ হয়নি। আগে এই ধরণের খবর শুনলে কত খুশী হতাম। আবার মনে পড়ল সেই সঙ্কীর্ণ জীবনের কথা। সেই লোকাচার, তথাকথিত মানসম্মান, অত্যাচার-অবিচার—সেই নরকযন্ত্রণার কথা। আমাকে আমীর সেই মরণ-কূপ থেকে তুলে এনেছে। পাঁক থেকে যেন একটি পদ্মফুল তুলে এনেছে—আমীরের প্রতি আমার মন কৃতজ্ঞতায় কানায় কানায় ভরে গেল। আমীরের সঙ্গে কত সুখে আছি। এই অল্পদিনের মধ্যেই আমীরের সঙ্গে থাকতে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে অন্যকথা ভাবতে ভালই লাগছে না।

ইচ্ছে করল আমীরকে একটু আদর করি। সোহাগ করে তাকে কাছে টেনে নিই। মামু চলে যাক। কিন্তু মামুকে অত সম্মান করার কি আছে। সে কে? আমিই বা কে? ওর উপস্থিতির জন্য আমার জীবনের আনন্দময় মুহূর্তগুলো কেন নষ্ট করব। সময় তো আর ফিরে আসে না। আমীরকে কাছে টেনে নিয়ে তার কাঁধে হাত দিয়ে বসলাম। আমাদের সামনের পাহাড়ের পেছন দিয়ে চাঁদ উঠছে। প্রবাদ আছে সমুদ্রের সঙ্গে চাঁদের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ঠিক সেই রকমই জ্যোৎস্নালোকের সঙ্গে আমার রক্তের যেন একটা সম্পর্ক রয়েছে। আমীর আমার হাত ধরে টেনে তুলল। সমুদ্রের তীরভূমিতে নিয়ে যাবে! বেচারা মামু! আমাদের দুজনকে চলে যেতে দেখে সে মুখ ফিরিয়ে বসে ঠাকুর-দেবতার নাম আওড়াতে শুরু করেছে!

—মামু, আমরা চললাম। তুমি আজ রাত্রে এখানেই ঘুমোবে তো?

—এখানে? তোমরা চললে কোথায়? মামু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

—বেড়াতে যাচ্ছি।

আমীর বলল, তাড়াতাড়ি চল।

—আমি চলে যাব। রেলগাড়ি ক'টায়?

আমি খলখলিয়ে হেসে বললাম, রেলগাড়ির খবর আমরা কি জানি!

—যাক, আমাকে একটু শহরের দিকে এগিয়ে দিতে বল।

—আমীর এখন যাবে না। আমি যেতে দেব না। ঐ কোণে একটা চটের টুকরো আছে পেতে ঘুমোতে পার।

—আর কোন কিছুর ভয় নেই ত?

—মাঝে মাঝে অবশ্য দু'একটা সাপ, শেয়াল এসে আবার ফিরে যায়! আমীর বলল।

আমীর আবার তেলুগু ভাষায় কথা বলল। কতদিন ওঁর মুখে তেলুগু শুনিনি। মামু কথায় কথায় বলল, আমার তেলুগুর মধ্যে নাকি অনেক উর্দু শব্দ ঢুকে গেছে।

—না মামু সাপ-শেয়ালের ভয় নেই। এমনি আমীর বলেছে।

মামু বিড় বিড় করছিল।

—তোমার যদি মামু হয় আমার কি হবে বলো তো?

—তুমি তো মুসলমান, আমার মামু তোমার আবার কি হবে?

—তা নয়, ধর আমি তোমার স্বামী, তাহলে···!

—তুমি আমার স্বামী হলে তোমার সঙ্গে ঘর করতে আসতাম নাকি?

—আচ্ছা এখন আসি। বেঁচে থাকলে কাল ভোরে আবার দেখা হবে। আর তোমার দেখা না পেয়ে শুধু যদি তোমার হাড়গুলো দেখতে পাই তাহলে নামাজ পড়ে কবর দেব। মুসলমানী স্বর্গ দেখতে পাবে। আমীর বলল।

দুজনই হো-হো করে হাসতে লাগলো। আমার মন কেমন করল। সত্যিই তো মামু হয়ত ভয় পাবে। যাই হোক আমার প্রতি মামুর একটা স্নেহ আছে। আমি আমীরের কাঁধে হাত দিয়ে যেতে যেতে পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখি মামু আমাকে দেখছে। চীৎকার করে বললাম, মামু কোন ভয় নেই। আমি মিছামিছি তোমাকে ভয় দেখিয়েছি। আমরা দু'তিন ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি।

মামুও চিৎকার করে বলল, এখন এই মাঝ রাতে বেড়াতে না গেলেই কি নয়! জন্তু-জানোয়ারের ভয়ও কি তোমাদের নেই।

আসতে হল তার কাছে। হাসি পেল। কাছে এসে তাকে বললাম, মামু এখনও কি আমি তোমাদের ঘরে আছি যে আমার উপরে খবরদারী করছ!

—তোমার ভালর জন্যই বলছি।

—মামু ওসব কথায় কোন লাভ হবে না।

—তুমি যা করেছ তাতে আমি লজ্জা পাচ্ছি আর তুমি গর্ব করছ! এই কি তোমার ভালবাসার নমুনা! একেই কি বলে ভালবাসা! এই ভাবে বনে-ভাগাড়ে, যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানোই কি ভালবাসা।

আরও অনেক কথাই মামু বলেছিল। আমি কানে তুলিনি।

তারপর ছুটে চলে গেলাম। যেতে যেতে পিছন ফিরে তাকালাম মামুর দিকে। লক্ষ্য করলাম মামু আমার দিকে তাকাচ্ছে। বয়স্থা মেয়ে ছুটছি এতে যেন আশ্চর্য হয়েছে মামু।

সাত-সকালে মামু বেরিয়ে পড়লে আমীর মামুকে বলল, এরপর মামীমারা আসবেনা তো? তুমি বলে ছেড়ে দিলাম, অন্য কেউ হলে পুঁতে রাখতাম। মামু হন-হন করে চলে গেল।

আমি বললাম, নরুস্সু ঠাকুরপোকে একবার আসতে বলো।

নরুস্থ ঠাকুপোর সঙ্গে ছেলেবেলায় খেলতাম। অনেকে ভেবেছিল ওর সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে। কিন্তু ওর মনে ওসব ছিল না। পড়াশুনা নিয়েই ও ডুবে থাকত। ওর হাবভাবেও ঐ ধরণের কোন চিন্তা প্রকাশ পেত না। বিয়ের পরে ও আমাদের বাড়ীতে এলে কেউ অনুভব করত না যে একজন পুরুষ মানুষ এসেছে। আমীরকে বলেছিলাম, স্বামীর সঙ্গে ঘর করার সময় উষর মরুভূমিতে নরুস্থর সাহচর্য আমার ভালই লাগত। আমীর বলত, আসুক না মেরে তাড়াবো! নরুস্থর চরিত্রের ভাল দিকগুলোর প্রশংসা করলে আমীর রাগে গজগজ করত। একদিন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে চিৎকার করে বলে উঠল, এই যে নরুস্থ, এতদিনে এলে তাহলে। আমি তাড়া-তাড়ি গিয়ে দেখি সামনের একটি শেয়ালের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমীর বলছে। মাঝে একদিন কয়েকটা হাড় জোগাড় করে এনে রেখে আমাকে বলেছিল, এসব তোমার নরুস্থ ঠাকুরপোর জন্য রেখে দিয়েছি। একদিন ভোরে তার কি খেয়াল চেপেছে কে জানে। হঠাৎ আমীর আমার পা কামড়ে দিল! ঘুম ভাঙতেই বলল, এইমাত্র তোমার নরুস্থ ঠাকুরপো কামড়ে চলে গেছে।

॥ চার ॥

আমীর কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে গেছে। ওর চাল-চলন হাব-ভাব সমস্ত কিছুই বদলে গেল। ভাত খায় না সারাদিন শুয়ে থাকে। ডাকাডাকি করলে বিরক্ত হয়। কারণটা যে কি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। শরীর খারাপ, আমার উপরে রাগ না কি, কিছুই জানি না। আমার খুব খারাপ লাগছিল। অনেক ভেবেছি ওর সম্পর্কে, ঠাহর করতে পারিনি কিছু। মাঝে মাঝে একটা ছেলে আসত তার

কাছে। নাম সুলেমান। সে আসলে আমীর ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ ফিসফাস করত। ওর সঙ্গে অনেকদিন শহর ঘুরে এল আমীর। যেদিন শহর থেকে ফিরত সেদিন আমীরকে আরও বিমর্ষ দেখাত।

সুলেমান ছেলেটা দেখতে-শুনতে মন্দ নয়। আমীরের সঙ্গে ও যখন কথা বলত, আমার ইচ্ছে হত, ডেকে ওর সঙ্গে কথা বলি। ওর মত আমার একটি ছোট ভাই যদি থাকত! কিন্তু ছেলেটি আমার দিকে তাকাত স-সঙ্কোচে, মাঝে মাঝে ভয়ে ভয়ে। ওর চাউনি দেখে বুঝতাম ওরা নিশ্চয় আমার বিরুদ্ধে ফষ্টি নষ্টি আঁটছে। আমি কি এমন অপরাধ করেছি যার জন্যে আমীর মুষড়ে পড়েছে! আমীরের শরীর ভেঙে যাচ্ছে সুলেমানের জন্যে। ও যেদিন থেকে আসছে সেদিন থেকেই তো···

আমাদের সম্পর্ক দিন-কে-দিন আরও খারাপ হল। বুঝলাম আমীরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করে কোন লাভ হবে না।

চেষ্টা করতে হবে সুলেমানের কাছ থেকে জানার। কিন্তু সুলেমান কি বলবে? সে ত আমার দিকে কেমন যেন তাকায়। কিন্তু যে ভাবেই তাকাক, আমীরের ভালর জন্যেই সুলেমানের পেট থেকে আমার কথা বার করতেই হবে। কারণ আমাকে জানতে হবে।

সেদিন সন্ধ্যায় একা নদী পেরিয়ে বালির ওপর দিয়ে হেঁটে ওপারে উঠলাম। সূর্য প্রান্তর পেরিয়ে দিগন্তে তার শেষ রশ্মিচ্ছটা ছড়িয়েছে, ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া লাগছে আমার গায়ে। খড়-কুটোগুলো উড়ে এসে লাগছে আমার পায়ে। বালি ছুঁয়ে ছুঁয়ে কয়েকটা পাখী উড়ছে, ওরা মাঝে মাঝে গাছে বসে আমার দিকে তাকাচ্ছে। কয়েকটা পাখী নীড়ে ফিরে যাচ্ছে। বলাকা আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে আমার নিঃসঙ্গতাকে স্পষ্টতর করে তুলছে। হঠাৎ দেখি গান গাইতে গাইতে সুলেমান এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আমার দিকে চোখ পড়তেই আশ্চর্য হয়ে সে থমকে

দাঁড়াল। পরক্ষণেই মাথা হেঁট করে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। আমি ওর পথ আগলে তার কাছে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললাম, আমাকে বলবে না ?

লজ্জা পেয়ে চমকে উঠে সে বলল, কী ?

—সেই খবর। যে-খবর তুমি এনেছ।

—কোন খবর আনিনিতো ! বলেই সে আবার পাশ-কাটিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করল। চাপা হাসি হেসে তার দিকে তেরছা ভাবে তাকিয়ে তার কাঁধে হাত দিয়ে চোখে চোখ রেখে বললাম, আমাকে বলবে না ?

ঘাবড়ে গেল সুলেমান। বিড় বিড় করে বলল, কি বলব—কিছুই তো জানি না ! তারপর তাকে কাছে টেনে নিয়ে গালে হাত দিয়ে বললাম, আমাকে বলতে হবে। আমার দিকে চোখ পড়লেই তুমি মুখ ঘুরিয়ে নাও কেন ? আমি কি করেছি ? তলে তলে নিশ্চয় তোমরা আমার বিরুদ্ধে কিছু করছ। তুমি আমার আমীরের মন বিগড়ে দিচ্ছ। বাইরে ভাল মানুষের মত দেখালেও, সত্যিই কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে…কিন্তু তোমার ভেতরে এত গরল কেন ? আমার যে নিজের বলতে এ-সংসারে আর কেউ নেই। আমার পেছনে লেগে তোমার কি লাভ বল ত ? তোমার দিদি থাকলে কি এইভাবে তাকে কাঁদাতে ?

আমার চোখের দু'কোণ বেয়ে জল গড়াল। ক্ষীণকণ্ঠে সে বলল, আ-মি কি করেছি ?

—কিছু যদি না করে থাক তাহলে কেন এমন হলো ?

সুলেমানের চোখেমুখে একটা অস্বস্তির ভাব। একদিকে আমীরের গোপন কথা প্রকাশ করার ভয় আর অন্যদিকে আমার চাপা কান্না, আমার কাতর প্রার্থনা, তাকে নাড়া দিয়েছে গভীরভাবে। আমার চোখের ফোঁটা-ফোঁটা জলে সে যেন নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত আমীরেরই যেন জয় হল। সুলেমান আবার আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। বুঝলাম তার মন কিছুটা ভেজাতে পেরেছি। তার চোখে কেমন একটা পালাই-পালাই ভাব। আমীরের কথা আমাকে জানানোর মত সাহস নেই। অথচ আমার দিকে বেচারা তাকাতেও পারছে না। কোন পুরুষ তা পারে না। একটি যুবতীর আবেদনকে অবহেলা করার মত মনোবল শতকরা একজন পুরুষেরও থাকে কিনা সন্দেহ।

—আমার দিকে তাকাও। লক্ষ্মীটি, আমাকে বল। তোমাকে বলতেই হবে। আমি জানি তুমি নিশ্চয় বলবে। বলে অর্থপূর্ণ একটা হাসি হেসে তাকে আরও কাছে টেনে নিলাম।

খুব লজ্জা করল। আমার সৌন্দর্যকে এই ধরণের কাজে ব্যবহার করেছি বলে সংকোচ হল। কিন্তু করব নাই বা কেন! আমার গোটা জীবনটাই তো নষ্ট হতে চলেছে। সুলেমানও পারল না নিজেকে ঠিক রাখতে। আমার কাছে সব খুলে বলল। তারপর আমাকে সেখানে ফেলে হরিণ শাবকের মত পালিয়ে গেল।

আমি ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে হাঁটছি। মাটির বুকে ডানা মেলে নেমেছে অন্ধকার। তালপাতাগুলো বাতাসে নড়ছে। সেই নিস্তব্ধ প্রান্তরে তালপাতার শব্দ কেমন ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছে। পেঁচারা ডাকছে। দূরে দু-একটি শেয়ালও ডাকছে।

ভাবছি শেষ পর্যন্ত আমার এই গতি হল। আর কি কাজে লাগব আমি। আমীরকে আকর্ষণ করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি?—কথাটা ভাবতেই মাথা ধরে এল। আমার জীবনের স্বার্থকতা বুঝতে পারছি না। কি হবে আমার—কোনদিকে যাব। আমীরের ওপরে খুব রাগ হল। এভাবে আমাকে ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছাই

যদি ছিল তবে আনল কেন? নিজের সুখের জন্য যদি আমাকে ছেড়ে দেয় তাহলে আমি যাব কোথায়? নদীর জলের ছোঁয়া লাগল আমার পায়ে। হঠাৎ মনে পড়ল অনেক মধুর ঘটনা। ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগছে। রোমন্থন ঘটছে অতীত স্মৃতির···কিন্তু আজ একি হল আমার!

হয়ত মামুর কথাই ঠিক। যারা শরীর দেখে আকর্ষিত হয় তাদের ভালবাসা হয়ত ক্ষণস্থায়ী। যে আমীর আমাকে, একজন ব্রাহ্মণের বিয়ে করা বউকে পরের বউ বলে মনে না করে ঘর করেছে সেই আমীর যে আরেকজনের সুন্দর দেহলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে মজবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে। যত অসহ্যই লাগুক এটা ধ্রুব সত্য। আমি কি তাহলে ভুল করলাম? মামুই কি তাহলে দূরদর্শী, বুদ্ধিমান? এই সব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘরে পৌঁছোলাম।

সমস্ত জগৎসংসার ঘন অন্ধকারে যে ডুবে গেছে। মানুষের বিচারশক্তিও যেন তাতে হারিয়ে গেছে। আমার একাকীত্বের সঙ্গে আজকের এই অন্ধকারের কোথায় যেন একটা মিল আছে। কুঁড়ে ঘরের এক কোণে শুয়ে পড়ে আছে আমীর। আমীরের দিকে তাকালাম। বুকে আমার কি যেন বিঁধছে। মন আমার নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ছে। আমীরের দিকে তাকিয়ে মুখে যে-গালাগাল এসছে তাই পাড়লাম। আমীর উঠে বসল। গা-ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। মনে হল আমার গালাগাল শুনে এই মুসলমানটা খেপেছে! আর আমাকে আস্ত রাখবেনা। কিন্তু কেন জানিনা সেই মুহূর্তে আমার কোন ভয় ছিলনা। পরক্ষণে লক্ষ্য করলাম আমীর নড়ছে না। পাথরের মত বসে আছে। আমিও বসলাম। বাতাসে আমাদের কুঁড়ে ঘরের পাতাগুলো নড়ছে। উনানের আগুন হাওয়ায় মাঝে মাঝে দপ্‌ করে উঠছে। দূর থেকে ভেসে

আসছে শেয়ালের ডাক। একটি তারা খসে পড়ল। আমার মন ভিজল। আমীরের কাছে গিয়ে তার মাথায় গালে হাত বুলিয়ে বললাম, ওর প্রতি তোমার এত টান? ওকে তুমি খুব ভালবাস, না? আমীর কাঁদল। আমার মন হু-হু করে উঠল। আমীর জেদী কিন্তু তার চোখে এখনও জল। এতক্ষণ ওর উপর আমার যত রাগ জমেছিল সব মুহূর্তে জল হয়ে গেল। সেদিন সারারাত আমীরের বুকের উপর মাথা রেখে শুয়ে ভেবেছি।

পরের দিন দুপুরে সুলেমান এসেছে আমীরের সঙ্গে কথা বলতে। আমি নদী পেরিয়ে আমবাগানে গিয়ে একা বসলাম। সুলেমানকে এই পথেই ফিরে যেতে হবে। কাল ভেঙে পড়েছিলাম বটে কিন্তু আজ আবার সাহসে বুক বেঁধেছি। আমীরকে এতদিন যে এত আনন্দ দিয়েছি তাতে নিজেও তো আমি কম আনন্দ পাইনি। কিন্তু এখন আমার দুঃখকে তার আনন্দের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চাই—তার আনন্দই তো আমার আনন্দ। কথাটা ভেবে মনে মনে খুশী হলাম। ঐ আমবাগানকে আলোছায়া ঘিরে রেখেছে। বা, কি চমৎকার। কাঠবিড়ালিরা কী সুন্দর খেলছে। আমডালে বসে একটি কাক অনেকক্ষণ ধরে ডাকছে—কা-কা-কা-কা। পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্য কিরণ এসে পড়েছে আমার পায়ে। সুলেমান ঐ পথ দিয়েই যাচ্ছে। আশ্চর্য ওর চোখে কোন পাপ নেই। কখনও আকাশের দিকে, কখনও সবুজ পাতার দিকে অবাক দৃষ্টি মেলে হাঁটছে। কিন্তু কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইলাম। ও অনেক এগিয়ে যাওয়ার পরে পা টিপে টিপে পিছু নিলাম। শহরে ঢোকার আগে ও আমাকে দেখতে পায়নি। হঠাৎ পেছনের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে থামল। বলল, কি ব্যাপার?

—চল।

—কোথায় ?

—তুমি যেখানে যাচ্ছ।

—তুমি পিছু ধরেছ কেন ?

—আমার খুশী।

কথা বলতে বলতে আমার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে গেল। হঠাৎ ফিরে সুলেমান আবার প্রান্তরের দিকে হাঁটল। আমি তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে বললাম, কোথায় যাচ্ছ ?

—আমি যেখানেই যাই তোমার কি ?

—কেন যাচ্ছ ?

—আমার খুশী।

—শহরে যাবে না ?

সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখমুখের ভাব বদলে গেল। ভয় এবং রাগ দাপাদাপি করতে লাগল। সুন্দর পদ্মফুলে যেন হাড়ের টুকরো পড়েছে। অসহায়ভাবে সুলেমান বলল, আমি তোমাকে বলেছি বলেই কি এভাবে নাজেহাল করবে ?

—আমি তোমার বা আমীরের কোন ক্ষতি করবনা।

—তাহলে যেতে চাইছ কেন ?

—বলব পরে, চল।

—আগে বল।

—আমাকে বিশ্বাস কর না ? আমার কথা বিশ্বাস হয় না তোমার ? বলে তার গালে হাত দিলাম। গলে গেল। ভাবল। পেছিয়ে গেল। ভাবলাম। আমি কি অপরাধ করছি ! সুলেমানের উপর কোন অন্যায় করেছি। ওর নম্র স্বভাবকে নানাভাবে আমি নিজের কাজে ব্যবহার করছি। কিন্তু ওসব কথা চিন্তা করার অবকাশ নেই।

শহরে ঢুকলাম। এর আগে কোনদিন শহরে যাইনি। লোকে

আমার দিকে কেমন ভাবে তাকাল। কারও চোখে চোখ পড়লেই মুখ ফিরিয়ে নিতাম। মনে হল সবাই যেন আমার দিকে তাকাচ্ছে। মাঝে মাঝে কুকুরগুলো ঘেউ-ঘেউ করছে। শহরের লোক, রাস্তা, সব কিছুই আমার কাছে নতুন।

মেয়েটি দেখতে সুন্দর। এই সেই, যাকে আমীর ভালবাসছে। মুখে স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য, স্থূলাঙ্গী। ওর সামনে আমি দেখতে যেন একটি মেয়ের মত। ওর গাল দুটো ভরাভরা, চোখ বড় বড়। কথা বললাম ওর সঙ্গে। ওকে কত খোশামোদ করলাম। বললাম সব কথা। শুনে সে আশ্চর্য হল। গোড়ায় সে আমাকে বিশ্বাসই করল না। অনেক কথা বলে বিশ্বাস করালাম। ওর কথা শুনে মনে হল আমীরকে ও ভালবাসে না। আমীরই ওকে সাতপাকে বাঁধার চেষ্টা করছে। নিজের মানসম্মানের ব্যাপারেও সে যথেষ্ট সচেতন। কথায় কথায় বলল, ওরকম এক ভিখিরীর সঙ্গে ইয়ে করতে যাব কেন?

—টাকা চাই?

—না। আসল কথা ওর মত লোকের সঙ্গে ঘর করলে সমাজের লোকজন হাসবে, বিদ্রূপ করবে। নিজেকে অত খাটো করতে পারি না।

ও এতক্ষণ আশঙ্কা করছিল আমি চেঁচামেচি করব বলে। ভয়ে ভয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছিল। তারপর আমাকেই খোশামোদ করতে দেখে সে আশ্বস্ত হল।

পরের দিন সন্ধ্যায় আমীরকে নিয়ে গেলাম ওর বাড়িতে। আমি বসলাম পাশের ঘরে। ওদের ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ করে দিল।

শত চেষ্টা করেও কানে আঙুল দিয়ে বসে থাকতে পারলাম না। প্রতি মুহূর্ত ঈর্ষা হচ্ছে। আমীর ওকে চুমো খাচ্ছে। আশ্চর্য,

ওদের কথা আমাকে শুনতে দিচ্ছে না। মৃত্যু যন্ত্রণায় আমি দগ্ধ হচ্ছি। তবে ওই ঘরে বসে আমার একটা উপকার হয়েছে। ওদের এই সম্পর্ক বেশী দিন টিকবে না!

ঘরে ফেরার পথে আমীর সে-প্রসঙ্গে কোন কথা বলল না।

আমি যে এত বড় একটা ত্যাগ স্বীকার করলাম তার জন্যে সামান্য কৃতজ্ঞতাও সে জ্ঞাপন করল না। আমার মনে বড় লাগল। সুলেমান কিন্তু পরের দিন সাত-সকালে এসে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, সত্যিই তুমি কত মহৎ। বলেই চোখ ফিরিয়ে নিল। আমার মুখের দিকে সে তাকাতে পারল না।

দশদিন কাটল এইভাবে। প্রত্যেক দিন ওর ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা পাশাপাশি হেঁটে নিজেদের ঘরে ফিরতাম। শহরের আলো-গুলোকে পিছনে ফেলে আমরা কতদূর হেঁটেছি কিন্তু পথে একটি কথাও আমাদের হত না। শহর পেরিয়ে আমাদের সেই প্রান্তরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে মনে হত আমার আমীর আমারই আছে। বুকে সাহস সঞ্চারিত হত। একদিন ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আমীর আমাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল। আহা সেই মুহূর্তে যে আমার কি রকম লেগেছিল কী বলব। ইচ্ছে করল ওকে খুশী করার জন্যে আমি কি করব—পৃথিবীতে তার পছন্দসই আরও কোন তন্বীকে তার জন্যে এনে দেব কিনা। আমি যত রকম পারি কষ্ট করব। কিন্তু আমি চাইব তাকে খুশী করতে—তাকে আনন্দ দিতে। এইসব কথা ভেবে আমার মন উথালি-পাথালি করত। আমার মনের এই সামান্য তোলপাড়ের খবর ওর মনে পৌঁছে দেওয়ার ইচ্ছে করল। নীরব থাকলে তো প্রেমের অভিব্যক্তি ঘটে না। কি করে প্রকাশ করব। কিভাবে জানাবো। বার দিনের দিন। ঠিক আমি যে আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটল। আমি তাকে ডাকলাম ওর কাছে যাওয়ার জন্য। সে বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, যাব না। ধেৎ,ছিঃ—যাব না।

ভাবলাম আমীর তাকে কি ভাবে পেতে চেয়েছিল! এত অল্প দিনেই যখন এতটা বিরক্ত হচ্ছে তাহলে ওকে পাওয়ার জন্য অত ভেঙ্গে পড়েছিল কেন! এই ঘটনার পর আমার মনে হল পুরুষ মানুষের বয়স যতই হোক না কেন কয়েকটা ব্যাপারে তারা বড় ছেলেমানুষ। তারা নিজেরা জানে না কিসের জন্য তারা ব্যথা পাচ্ছে, কী চায় তারা, কেন চায়। ওরা যাদের ভালবাসে সেই প্রেমিকাদের উচিত মায়ের মন নিয়ে ওরা কি চায় তাই জানা। বউ যদি স্বামীকে সব সময় কাছে পেতে চায় তাকে নিঃশেষ করে আনন্দ ভোগ করতে চায় তাহলে স্বামীর মন গুমরে উঠে। মন ভেঙ্গে যায়, মেজাজ বিগড়ে যায়। কয়েকজন মেয়েমানুষ বোকামি করে স্বামীর মন একটু অন্য দিকে গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে হা-হুতাশ করে। হায়-হায় গেল-গেল রব তোলে। আমীর যখন আমার, সে যখন মনেপ্রাণে আমাকেই ভালবাসে তখন সে যার সঙ্গে ইচ্ছা ঘুরুক। এর চেয়ে সুখকর আমার কাছে আর কি হতে পারে! আমীর আমাকে কত সুখ দিয়েছে, শান্তি দিয়েছে আর আমি তার জন্যে এইটুকু করতে পারব না!

এই ঘটনার চারদিনের দিন রাত্রে অন্ধকারে আমরা পাশাপাশি শুয়ে আছি। আমীর আমার গালে হাত রাখল। দূরে শেয়াল ডাকছে। বিচিত্র পাখি ডাকছে। দূরের পাহাড়ের কোলে এক অংশের ঘাস আর ছোট ছোট পাতা সারাদিন পুড়ছিল। সেটা এই মাত্র নিভে গেছে। নিভে যাওয়ায় অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হয়েছে। একটা কালো চেহারা আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

—আমীর! একটা কালো চেহারা! ওঠ দেখতো কে?

আমীর তৎক্ষণাৎ উঠে বসল। আমি ওর কাছ থেকে একটু সরে শাড়িটা খুঁজছি। ও! এ-যে সেই মেয়েটি! আমীরের কাছে এসে সে বসল। আমি চলে গেলাম নদীর ধারে। বালির উপরে

বসলাম। নদী এখন ধীর স্থির নিস্তরঙ্গ। লক্ষ-কোটি নক্ষত্রের প্রতিফলন পড়েছে জলে। লক্ষ কোটি ফুল যেন ভাসছে জলে। বালিয়াড়ির উপর বইছে হাওয়া। মাঝে মাঝে একটু বালিও উড়ছে। নদীর জল তীরভূমি এবং পাহাড়ের বুকে একটু করে ধাক্কা দিচ্ছে। সুন্দর একটি শব্দ! আমার উপরে নক্ষত্রখচিত আকাশ, পেছনে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, যতদূর দৃষ্টি যায় জনমানব শূন্য। ঈশ্বরের পৃথিবীর সেই সৌন্দর্যময় অংশে আমীর আছে, আমি আছি আর আছে ওই শহুরে মেয়ে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে খুব আনন্দ হল। আমীরের জন্যে এই মুহূর্তে আমি কত বড় একটা ত্যাগ করছি। ত্যাগ করতে সবাই পারে না। ত্যাগ করার শক্তি ঈশ্বরদত্ত। আমীরের জন্যে আমি ত্যাগ করেছি—এই ধরণের ত্যাগের কথা পৃথিবীর প্রেমিক-প্রেমিকারা জেনে যাক। নিজে কষ্ট স্বীকার করেও অন্যকে আনন্দ দেওয়ার যে বোধ—তাতেই আছে আনন্দ। তার চেয়েও আনন্দ আর নেই।

আমীরের ভালবাসা সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে আমি নিজের মধ্যে হারিয়ে গেলাম। পেছনে কখন যে আমীর এসে দাঁড়িয়ে আছে টের পাইনি। আমার পিঠে হাত রাখল, আমার গলা জড়িয়ে ধরল, আমার গাল চুমোয় চুমোয় ভরে দিল। বলল, আমাকে ওর কাছে ছেড়ে চলে এলে কেন?

—তোমার প্রতি ওর কত টান। তা না হলে কি আর সে এই মাঝ-রাতে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে গোপনে মানসম্মান সমস্ত কিছু তুলে রেখে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসে?

—ওকে আমি চাইনা।

—ওকে পাওয়ার জন্য তুমি কত ছটফট করছিলে, মনে নেই?

—তা হয়ত করেছি।

—এখন যে তুমি তাকে ছেড়ে দেবে তা সে কল্পনাই করতে পারে

না। ঘরের কোণের একটি মেয়েকে টেনে এনে পথে বসালে, আর তাকে এখন ছেড়ে দেবে?

আমীর অনেকক্ষণ নীরব থেকে বলল, রাগ কর না। আসল কথা ওর কথাবার্তা আমার ভাল লাগে না। ও চায় তোমাকে আমি······আবার যদি আসে আমি কিন্তু আর আস্ত রাখব না··· মাগিটার লজ্জাসরম একটুও নেই।

পুরুষমানুষের মন মাঝে মাঝে কত কঠোর হয়ে ওঠে। ভয় পেলাম। আমার প্রতি ওর যদি টান কমে যায় আমার প্রতিও তো আমীর কঠোর হতে পারে।

—আমীর, ওকে তোমার ভাল লাগে না কেন?

—তুমি জান না মাগিটা আমাকে গিলে খেতে চায়!···মাঝে মাঝে আমার দম নিতে কষ্ট হয়।···আমার হাঁটুতে ব্যাথা করে।

সেই গাঢ় অন্ধকারে পথ খুঁজে-খুঁজে সে এল আমাদের কাছে। ওর মতে সে নিজে নির্দোষী, আমীরও ভালমানুষ। যত দোষ আমার।

তারপর বেচারী আমাকে গাল পাড়তে পাড়তে চলে গেল। ওর উপর আমার দয়া হল। কিন্তু আমি আর কি করতে পারি। বেচারী—

॥ পাঁচ ॥

সেদিন শারদরাত্রি। 'আমীরের আঙুলগুলো আমার গলায় খেলা করছে। আমার চুল উড়ে তার মুখে পড়ছে। আমরা দুজনে পাহাড়ের চুড়ায় বসে উপভোগ করছি জ্যোৎস্নারাত। নিচে অদূরে তাকিয়ে দেখি নজরে পড়ছে আমাদের কুঁড়েঘর। নদী ছবির মত

দেখাচ্ছে। আনন্দে আমার মন ভরে গেল। আমাদের পিছনের দিকে শহর। সেই শহরে কত বড় বড় বাড়ি আছে। অনেকগুলো গাড়ি আছে। আর রয়েছে সৈন্যসামন্ত, শাসক-শোষক। সেখানে বসে বসে ঈশ্বরের পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় লীলা দেখছি। অনেকক্ষণ পরে কথা বললাম।

এখন আমরা দুজনেই উর্দু ভাষায় কথা বলছি। আমার উচ্চারণ নিজের কানেই খারাপ ঠেকছে। অথচ আমীরের কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন একটি গান শুনছি। কথায় কথায় রাজাবাদশার কথা উঠল। সে-গল্পে রাণী-বেগমেরাও অনুপস্থিত নয়। আমীর বাদশার পার্ট করল আর আমি বেগমের—আমরা দুজনে সেই পাহাড়ের চূড়ায় নাটক করছি। আমাদের অভিনয় আমরাই দেখছি। আমীরকে কটাক্ষ করে আমি বেগমের মত একটি কথা বললাম। আমীর আমাকে তাড়া করল। আমি ছুট দিলাম। পাহাড়ের উপরে দিয়ে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আমি নামলাম প্রান্তরে। আর ছুটতে পারছিনা। কেন জানিনা মনে হল আমীর আমাকে ধরতে পারলে কিছু একটা করে বসবে। ইচ্ছা করল পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি—আমীরের চোখে দুফোঁটা জল বেরোক কিন্তু আমীর ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে ধরে ফেলল।

—আ লাগছে।

—দেখ দেখি তোমার জন্য আমার কি অবস্থা হয়েছে। আমি প্রাণখুলে হেসেছি। আমার হাসি পাহাড়ের গায়ে ধ্বনিত-প্রতি-ধ্বনিত হল। তারপর সবুজ ঘাসের উপর আমাকে শুইয়ে দিয়ে আমার নিতম্বে মাথা রেখে আমীর শুয়ে পড়ল।

আমি হাত বুলোচ্ছি তার চুলে। আমাদের সারা অঙ্গে পড়ছে জ্যোৎস্নার আলো। দূরের অন্ধকারকে বিদ্রূপ করছে যেন আমাদের

কাছের জ্যোৎস্না। এই পাহাড়ের কাছে হয়ত এর আগে বহু প্রেমিক-প্রেমিকা এসেছে বেড়াতে। অনেক প্রেমের কাহিনী হয়ত এই পাহাড়ের কোলে গড়ে উঠেছে। কত লোকের মন ভেঙেছে। কত লোকের মন জুড়েছে। কত তরুণ-তরুণীর চোখের জলে এই পাহাড় ভিজেছে। আবার আমাদের মত অনেকের হাসি হয়ত এখানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আমরাও আজ আছি এখানে, হয়ত কাল থাকব না।

আমীরের ঠোঁট আমার গালের একটি অংশে যেন আটকে গেছে। হঠাৎ উঠে বসে আমীর বলল, না এমন সুন্দর জ্যোৎস্নায় তোমাকে আর একবার ভাল করে দেখতে ইচ্ছে করছে। তারপর ক্লান্তি যখন নেবে আসবে শরীরে, তোমার বুকের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ব।

সেদিন রাত্রে কত সুন্দর সুন্দর কথাই না বলল আমীর। আমার মনে হয়েছিল আমীর অন্ধ্র দেশে না জন্মে যদি জন্মাত প্যারিসে তাহলে মহাকবি হতে পারতো।

আমীরের ভালবাসা অন্ধ ভালবাসা নয়। ওর ভালবাসার মধ্যে একটা গভীরতা আছে। ওর মত রসজ্ঞলোক কাউকে ভালবাসলে সে গভীর ভালবাসা কাকে বলে বুঝতে পারবে। আমীর যখন আমার দিকে তাকায় মনে হয় যেন তার চোখ আমাকে গিলছে। ওর চাউনি না দেখলে আমি নিজেকে ভালবাসতে পারতাম না।

আমীর বলেছিল, এই শোন, আমি খুব সৌভাগ্যবান। আমার চোখে ধাঁ-ধাঁ লাগানোর জন্য, তোমার বাবা-মা—দু'জন ব্রাহ্মণ অনেক তপস্যা করে তোমাকে পৃথিবীতে এনেছে। আমীর আমার পেটে হাত দিয়ে বলল, ধেৎ এই অংশটা কেমন যেন উঁচু হয়ে যাচ্ছে। ভাল লাগছে না আমার।

—আমীর, পেটের ভেতরে কেউ জায়গা চাইছে, আরো বেশী জায়গা। বুঝলে না? কি বোকা তুমি।

ভেবেছিলাম আমার কথা বুঝতে পেরে আমীরের চোখমুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। আমাকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরবে। চুমোয়-চুমোয় সারা অঙ্গ ভরে দেবে। তাই আমি আবেশে চোখ বুজলাম। মানসিক প্রস্তুতি নিলাম তাকে আজ পরিপূর্ণ আনন্দ দেওয়ার জন্য।

কিছুক্ষণ পরেই চোখ খুলে দেখি সে মাথা নিচু করে ঠোঁট কামড়াতে-কামড়াতে কি যেন ভাবছে।

অনেকক্ষণ কথা বলেনি। নিরুৎসাহিত কণ্ঠে বলল, চল ঘরে ফিরে যাই। আর এখানে ভাল লাগছে না।

আমার বুকে কে যেন একটা বিরাট পাথর রেখে দিয়েছে। অমন সুন্দর জ্যোৎস্নারাতেও চোখে অন্ধকার দেখছি। বারবার কানে বাজে আমীরের কথা, ধেৎ এই অংশটা কেমন যেন উঁচু হয়ে যাচ্ছে…।

চারদিক দিয়ে কালো পাহাড়গুলো যেন এগিয়ে আসছে। সারা আকাশে কালোমেঘের টুকরো জমছে।

—দেখ, ওসব উঁচু পেট আমার ভাল লাগে না। তুমি ওর একটা ব্যবস্থা কর।

—ওমা! সেকি কথা! কী ব্যবস্থা করব?

—নষ্ট করে ফেল।

—আমীর! সে-যে তোমারই সন্তান।

—ছাই। কোথাকার একটা ভূত এসে জাঁকিয়ে বসেছে; ছেলেপুলে আমি চাই না! ওটাকে তুমি নষ্ট করে ফেল।

থ-বনে গেলাম। আমীরকে ভালবেসেছি বলেই ওর সঙ্গে এখানে এসেছি—অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু আমীরের এই কথা রাখতে ইচ্ছে করছে না। ভ্রূণ-হত্যা মহাপাপ! কি অধিকার

আছে আমার। এ-ধরণের কাজ করলে ঈশ্বর চটে যাবেন—তিনি আমাদের দুজনকেই শাস্তি দেবেন। কে জানে শাস্তি দেওয়া শুরু করে দিয়েছেন কি না!

পেটের সন্তানের প্রতি তখনই কেমন যেন একটা টান বোধ করলাম। সেই টানের জন্যই আমীরের কাছে অসহ্য লাগা সত্ত্বেও আমার কাছে ভাল লাগছে। সামান্য একটা বিড়ালও তো তার সন্তানকে রক্ষা করে। আমিই বা পারব না কেন? না, এ-ব্যাপারে আমীরের কথা রাখতে পারব না। আমাদের সন্তানের রক্ষার ভার আমার। তার জন্যে যদি কিছু ঘটে ঘটুক। আমীর যদি এ-কারণে আমাকে ছেড়েও দেয়, ছেড়ে দিক।

তারপর আমীর আমাকে কত বোঝাল। কিন্তু আমি ওর কথা কানে তুলিনি। সেদিন আমীর টের পেয়েছিল আমি জেদী মেয়ে। বুঝেছিল আমার শুধু রূপ নেই, জিদও আছে।

রাগে গজগজ করতে করতে ঘরের আশেপাশে ঘুরতে লাগল। আমি ওর পিছু পিছু গেলাম। সে আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। পাহাড়ের কাছে আগেও গিয়ে বসতাম কিন্তু তত একা মনে হত না। কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল।

এরপর অন্য একদিন আমীর মদ খেয়ে এসে আমাকে খুব মারধোর করল নেশার ঘোরে। নেশা ভেঙে গেলে অবশ্য কাছে টেনে নিয়ে আদর একটু করল।

অন্যদিন আমার জন্য একটি ভাল শাড়ী এনে দিল। ভেবেছিলাম আমীর হয়ত ওই শাড়ী পছন্দ করে…তখনই কানে এল তার কথা, আমি না থাকলে এই শাড়ীটা পারবে।

সেই মুহূর্তে মনে হল সে যেন আমার মুখে থুথু ফেলেছে। আমার গোটা জীবনটা কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছে!

তারপর চার-পাঁচ দিন আমীরের কোন পাত্তা ছিল না। আমার উপরে রাগ করেছে। ওর অনুপস্থিতিতে শাড়ীটা পরতে আমি গররাজী হয়েছিলাম বলে। কারণ জানতে চেয়েছিলাম এই ধরণের কথার। তারপর থেকেই চার-পাঁচদিন আমীর আর ঘরে ফেরেনি। বুঝিয়ে দিল ওর কথা না রাখলে সে আর আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না। ওর এই কঠিন মনের কথা বুঝে খুব দুঃখ হল আমার। একা একা কেঁদেছি।

তারপর যেদিন ফিরেছিল সেদিন দুপুরে ওর সঙ্গে খুব ঝগড়া হল আমার। ছ'মাসের জন্য আমাকে ওখানে ফেলে সে কোথায় যেতে চায়। কান্নাকাটি করে আমি ওকে যেতে দিতে চাইনি। জানিয়ে দিল সে আমার কথা রাখবে না। আমার বাধা দেওয়ার কারণ জানতে চাইল। কি করে তাকে বোঝাব। আমার মুখে শুধু ঐ এক কথা—কোনক্রমেই যেতে দেব না। আমার এই গোঁয়াতু´মি তার সহ্য হল না। আমাকে লাঠি দিয়ে মারল। আমি শুধু কেঁদেছি। সেদিনের মত আমি আর কোনদিন কাঁদিনি। আমার কান্নাও তার সহ্য হল না। চিৎকার করে আমার পেটে লাথি মেরে কিছুক্ষণ পরে বলল, এই শুয়োরের বাচ্চার জন্যই এত ঝামেলা! এ তোমার পেটে না ঢোকার আগে বেশ ছিলাম।

কেন জানি না আমীর আমাকে এত মারা সত্ত্বেও সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল ওর পা জড়িয়ে ধরি, ওর পায়ে চুমো খাই।

আমীর অগ্নিদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। তার দীর্ঘ বলিষ্ঠ মুঠো দৃঢ়তর হচ্ছে। রাগে গজগজ করছে। গোটা শরীর থরথর করে কাঁপছে। ওর চোখমুখ দেখে আমারও রাগ হল, কান্না পেল। কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন একটা গর্ব হল। যে প্রেমিকের দৃঢ়তা এবং পৌরুষ আছে তার দিকে তাকালে কোন্ প্রেমিকার মন খুশীতে না ভরে ওঠে।

সেদিন রাত্রেই মুষলধারে বৃষ্টি হল। সন্ধ্যা থেকে এক নাগারে সারারাত বৃষ্টি পড়েছে। বেশ টের পাচ্ছি! সারা বিশ্ব যেন জলে ডুবে যাবে। রাত আর কাটতে চায় না। আমাদের কুঁড়ে ঘরের চার দিকে থৈ-থৈ জল। ঘরে জল ঢুকলে হয়তো আমীরের খেয়াল হবে। গম্ভীর ভাব কাটিয়ে দুটো কথা বলবে। রাত ক' প্রহর হয়েছে টের পাচ্ছি না। ঠাণ্ডা বাতাসে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছি। ঘরে জল ঢুকছে। ঘরটা ডুবে যাবে। চিৎকার করে উঠলাম, আমীর মারা যাচ্ছি। সে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। জলে ঘরটা বুঝি ভেসে যাবে। কিন্তু আর কোন ভয় নেই। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা আমাকে আমীরের লৌহদৃঢ় বাহুবন্ধন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আ—কত দিন পরে পেলাম সেই নিবিড় আলিঙ্গন, সেই উত্তাপ। আমীর তার শরীরের সঙ্গে আমাকে যেন এক করে ফেলতে চায়। বললাম আমীর, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। একটু ছাড়। আমীর সামান্য একটু ঢিল দিয়ে বলল, আমার কথা রাখবে না? তার দুটো হাত দিয়ে, দুটো পা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে আমাকে বেঁধে বলল, আমার কথা রাখবে না? আশ্চর্য, এই ননীর শরীরের কোন্ জায়গায় এতটা জিদ আছে বল তো?

—জিদ আমার মধ্যে নেই।

—আছে।

কোন কথা বলতে পারলাম না। নানান চিন্তা মগজে গিজগিজ করতে লাগল।

আমীর কঠিন অথচ ছলছল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আবার বলল, আমার কথা তাহলে রাখবে না?

দু-ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ওর গাল বেয়ে। আমার মনে হল যেন ওর চোখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে! একটা প্রস্তর

মূর্তির চোখ ফেটে যেন জল গড়াচ্ছে। আর ঠিক থাকতে পারলাম না। আমার মাথা ঘুরল। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে বললাম, আমীর, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তোমার সন্তানকে আমি মেরে ফেলতে পারব না।

আমাকে ফেলে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বিদ্যুৎ চমকে উঠল। লক্ষ্য করলাম আমীরের চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে। আমার ভয় হল কি জানি কি করে বসে! গম্ভীর গলায় সে বলল, আমি চলে যাচ্ছি।

আমি পাথর বনে গেলাম। কিন্তু এতবড় একটা সর্বনাশ হতে যাচ্ছে আমি কথা না বলে পারব কি করে। বললাম, কোথায় যাচ্ছ?

—যেদিকে খুশী। ছ'ছাসের আগে ফিরব না।

—আমীর, তোমাকে ছেড়ে আমি একদিনও……।—তোমার চাল-ডাল, নুন-তেল সুলেমান দেবে।

এই তার শেষ কথা। তার মন ফেরাতে কত কান্নাকাটি করলাম। তার পায়ে মাথা কুটলাম কিন্তু তবু সে আমাকে ফেলে চলে গেল। একবারও আমার দিকে ফিরে তাকাল না।

আমার আমীর বৃষ্টি মাথায় করে ঝিঁ-ঝিঁ ডাকা সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমাকে ফেলে একা চলে গেল।

॥ ছয় ॥

আগে ভেবেছিলাম আমীরকে ছেড়ে একদিনও বাঁচতে পারব না। আশ্চর্য, এখন আর তার অনুপস্থিতি আমি তেমন অনুভব করছি না।

আমীরের উপর একটা বিষয়ে খুব রাগ হত! একা আমাকে

ছেড়ে চলে গেল কেন! অভিমান হত ওর উপর। মাঝে মাঝে রাগের সাপ ফণা তুলত। যে কোন ভাবে ইচ্ছে করত তাকে শাস্তি দিতে। জেনে শুনে এই নির্জন জায়গায় কেন ফেলে গেছে? যদি চলে যাই এখান থেকে, নদীতে যদি ডুবে মরি, বাপের-বাড়ি যদি ফিরে যাই—এ-ধরণের আরও অনেক কথাই ভাবতাম।

সুলেমানের বয়স ষোল। দেখতে শুনতে বেশ সুন্দর। প্রথম দর্শনেই বেশ বোঝা যায় পুরুষানুক্রমে ধনী ও অভিজাত পরিবারের ছেলে। তার হাতের আঙুলগুলো কেমন সুন্দর কোমল লাল। চোখে যেন বিশ্বজোড়া স্বপ্ন। গাল তল্‌তল্ করছে। চলনে-বলনে সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটি ছন্দ। গম্ভীরভাবে সে যখন বসে থাকে মনে হয় যেন একটা পাথরের মূর্তি। কান পেতে কথা শোনে। ধীরে ধীরে কথা বলে। নীচতা যে কাকে বলে তা সে যেন জানে না। ও যেন যুগ যুগ ধরে সৌন্দর্যের পূজারী। আত্মার বিকাশে মগ্ন। ওর বাবা মা যেন অনেক তপস্যা করে ওকে পেয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা ছবি! আমীর চলে যাওয়ার দিনচারেকের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম ও আমার কথায় উঠতে বসতে পছন্দ করছে। শুধু খেতে আর ঘুমোতে বাড়ী যেতো। এছাড়া সারাক্ষণই থাকত আমার কুঁড়ে ঘরে। শুধু থাকত বললে ভুল বলা হবে, বসে থাকত আমার সামনে। আমার প্রত্যেকটি কথা কান খাড়া করে শুনত। মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি ফেরাত না। যত দিন যায় ক্রমশঃ আমি যেন আমীরকে ভুলে যাচ্ছি। আমীরের স্মৃতির রোমন্থন কমে আসে। আমার চোখের কোণে এক ফোঁটা জল দেখলেই সুলেমান ছট্‌ফট্ করত। আমার মুখে সামান্য দু'একটি চিন্তার রেখা দেখামাত্র ভেঙে পড়ত। পর মুহূর্তেই আমার সামনেই বসে নানা কথা বলে হাসাত। আমার পায়ে মাথা রেখে শুয়ে গান গাইত। আমার চোখে চুল পড়লে তা সরিয়ে দিত। আমার

আঙুলগুলোকে নিয়ে পুতুলখেলার মত খেলত। আমার প্রত্যেকটি আঙুলের নাম রেখেছিল। প্রত্যেকটাই বেশ মিষ্টি নাম, একটি একটি করে নাম ধরে ডাকত। আঙুলগুলোর সঙ্গে যেন কথা বলত। ওর কোমল গালে হাত বুলাতাম। ওকে রাগাতাম দু'চার কথা বলে। ওকে হাসালে যেন মাণিক ঝরে আর কাঁদালে মুক্তো।

এভাবেই আমার দিনগুলো কাটছিল। মাঝে মাঝে শুনতাম ওর কথা। ওর শৈশবের কথা বেশ হাসিখুশী মনেই শুনতাম। ওকে দেখে মাঝে মাঝে মনে হত আমার যদি অমন সুন্দর একটি ছেলে থাকত! ও-আমার কোলে বসলে মনে হোত যেন কোল আলো করে বসে আছে রাজপুত্তুর। প্রত্যেকদিন গোধূলি বেলায় আঁজলা ভরে ফুল নিয়ে আসত। রাত্রে আমার ঘুমের পরও সে ফিরে যেত না। আমাকে একা ফেলে রেখে যেতে তার ভয় করত। কত কবে বলতাম ফিরে যেতে, শুনত না আমার কথা।

জ্যোৎস্না রাত্রে আমরা যেতাম নদার তীরে। চাঁদের প্রতিফলন পড়ত জলে। শিয়ালের ডাক শুনতাম। মনে পড়ত আমীরকে। আমীরকে মনে পড়লে সুলেমান টের পেত। ও আমার মন অন্য-দিকে ফেরানোর চেষ্টা করত।

সুলেমান বলল, সত্যি আমীর তোমাকে কত কষ্ট দিচ্ছে। একজন শত্রুও এত কষ্ট দেয় না। আর একদিন বলেছিল আচ্ছা আমি বড় হলে, তুমি যেমন আমীরের জন্য কষ্ট পাও আমার জন্য কি কেউ এত কষ্ট ভোগ করবে।

অন্যদিন নদী পেরিয়ে আমরা গিয়েছিলাম এক আমবাগানে। সেখানে কাজুবাদামের গাছও আছে। বসলাম একজায়গায় দুজনে পাশাপাশি। বাতাসে পাতা ঝরছে। মাঝে দু'একটি বলাকা পথ ভুলে সেই বাগানে ঢুকে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে।

সুলেমানকে চটানো খুব সহজ। ও রেগে গেলে মুখটা বেশ

সুন্দর দেখায়। ওর দুধে-আলতা গোলা মুখের রঙ মুহূর্তে যেন লাল হয়ে যায়! তাই আমি ওকে চটাতাম। সেদিনও ওকে আমি চটিয়েছিলাম।

ও কোমল আঙুল দিয়ে আমার ঠোঁট স্পর্শ করল। আমি অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিলাম। নিজের অজান্তেই ওর হাত সরিয়ে দিলাম। আর কথা নেই, মুখ ঘুরিয়ে বসল। ওকে আরও চটানোর জন্য আমি নিজেও সরে গিয়ে দূরে বসলাম। উদাস দৃষ্টি মেলে আমার দিকে একবার তাকাল। আমি রা কাড়িনি। ওকে দেখিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। তৎক্ষণাৎ ছুটে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। ওর মুখ কি লাল দেখাচ্ছিল তখন! চোখগুলো ছল্‌ছল্‌ করছে। দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস, চোখ ফেটে জল এল বুঝি। ঝপ করে আমার জামা ধরল। তার হাতটা থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে। কামড়ে ধরল আমার ঠোঁটগুলোকে। বাঘের বাচ্চা যেন এই প্রথম রক্তের স্বাদ পেয়েছে! দারুণ ভাবে চটে গিয়ে বললাম, কি করছ সুলেমান? আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল সে।

সোনা-ঝরা সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশের আলো ঠিকরে পড়ছে তার চোখে-মুখে। আমার ধমক খেয়ে ও মাথা নীচু করে দাঁড়াল। বেশ লজ্জা পেয়েছে। তারপর কি যেন ভেবে চট্‌ করে ছুটে পালিয়ে গেল।

ভেবেছিলাম ফিরবে না। কিন্তু রাত্রে পা টিপে টিপে পিছন দিক থেকে এসে আমার চোখ চাপা দিয়ে বলল, আর কখন করব না। আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম, আমি ওসব পছন্দ করি না, বুঝেছ?

—তাহলে আমাকে চুমো খেলে কেন?

—তোমার দিদি তোমাকে কোন দিন চুমো খায়নি? যাক্‌ আর কোনদিন খাব না।

—আমিতো বারণ করছি না। তবে আমাকে কোন দিন চটাবেনা।

আমীর যে সেখানে একা ফেলে চলে গেছে, সেটা আমি এক-দিন হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিলাম। বুঝেছিলাম সুলেমান কেন আমাকে দিনে রাত্রে আগলে রাখতে চায়। রাত্রে ঘুমিয়ে আছি। হঠাৎ কানে গেল কার পদশব্দ। চোখ খুলে দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি কদাকার বিরাট চেহারা!

—তুমি কে?…এটাত আমার ঘর। তুমি ঢুকলে কেন?

—পথ ভুলে এসেছি।

ওর কণ্ঠস্বরেই বুঝলাম মিথ্যে কথা বলছে। বললাম, শহরের পথ ওদিক দিয়ে।

—আমি জানি না। নতুন লোক আমি। আজকে রাত্রে এখানেই ঘুমোতে চাই।

—কোন উপায় নেই। অসম্ভব!

—আমি এই অন্ধকারে এক পাও নড়তে পারছি না! আরও কাছে এসে বলল, এখানে তুমি একাই আছ'ত?

—এখান থেকে চলে যাও! কি কানে যাচ্ছে না কথাটা?

—তুমি'ত এখানে একা। তোমার ভয় করে না, আমি থাকি এখানে। তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

—আমাকে কোন সাহায্য করতে হবে না।

—তুমি না চাও আমি চাই।

তারপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর। আমি আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিলাম। আমার ছোরাটা খোলা ছিল। গেঁথে গেল তার বুকে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরল। তারপর সে থর্‌থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে আমাকে গালাগাল দিয়ে টলতে টলতে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। পরদিন থেকে সুলেমান ব্যবস্থা করেছিল এক দজ্জাল মেয়েকে আমার কাছে ঘুমোনোর।

দেওয়ালীর রাত্রি। বছর খানেক আগে ঠিক এই দিনটিতে

আমীর ছিল। আমরা উঠে ছিলাম পাহাড়ের চূড়ায়। কত আতস বাজি পুড়িয়েছি। আর আজ আমার পাশে সুলেমান। আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে বক্‌বক্‌ করছে। আমি অন্যমনস্ক। আমি যান্ত্রিকভাবে ওর কথায় হ্যাঁ, হুঁ করে যাচ্ছি। সুলেমান টের পেয়ে বলল, কই শুনছ না?

—শুনছি, তুমি বলে যাও।

—না তুমি শুনছ না। তুমি অন্য কথা ভাবছ।

এমন সুন্দর জ্যোৎস্নারাতে আমীর এক মুহূর্ত আমাকে ছাড়তো না।

—কি, কথা বলছ না কেন?

—আ, জ্বালিয়ে খেল। আমীরের কথা একটু নিশ্চিন্তে ভাবতে দেবে না। সুলেমান কেমনতর ছেলে। সব সময় কানের কাছে বসে ঘ্যানঘ্যান করছে। বিরক্ত হয়ে বললাম, একটু চুপ করে বসত সুলেমান।

এইত মাত্র ক'দিন আগের কথা। আমীর আমাকে কিভাবে ভয় পাইয়ে দিয়ে ছিল নদীতে ডুবিয়ে দেবে বলে···তাইত সুলেমান গেল কোথায়! একটা আপদ জুটেছে! উঠে তাকালাম কোথায় গেল, ঘরে ফিরে গেছে নাকি। তারপর ভাবতে ভাবতে ওকে খুঁজলাম, তা হলে কি সুলেমানও আমাকে একা ফেলে গেছে! একা আমাকে রাত কাটাতে হবে এখানে। খুঁজতে খুঁজতে গেলাম নদীর তীরে তাইত বালির উপরে শুয়ে আছে কে! হ্যাঁ, ঠিক সুলেমানইতো ডাকলাম। সুলেমান সাড়াশব্দ করল না, উপুড় হয়ে শুয়ে রইল। ওর পিঠের ওঠানামা দেখে বুঝলাম ও কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ব্যথা পেলাম, বললাম, তোমার সঙ্গে কথা বলিনি বলে রাগ করেছ? কি কথা বলছ না কেন? আমাকে ক্ষমা কর। সত্যি বিশ্রী লাগছে তোমার এই কঠিন নীরবতা। আরে না

তোমাকে উপেক্ষা করিনি···যাক যা হয়েছে, অত রাগ করলে চলে না। ওঠ।

ওর উপর একাধারে বিরক্তি এবং রাগ ধরল। আর একবার অনুভব করলাম আমীরের অভাব। অমন সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রে সুলেমানের সঙ্গে বিরক্তিকর সংলাপ ভাল লাগছে না। জীবনটা যেন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। এ জীবন বিফলে গেল। আর কিসের আনন্দ, আর আশা নেই এ জীবনে। কোন্ স্বার্থে বাঁচব। জ্যোৎস্না রাতের এই পাহাড়, নদী, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর সব কিছুই যেন আমাকে বিদ্রূপ করছে। হঠাৎ ফেটে পড়ে বললাম, সুলমান আমাকে এত জ্বালাচ্ছ কেন! সেকি, সুলেমান আবার গেল কোথায়!···

ইচ্ছে করছে ঐ নদীতেই ডুবে মরি। আমীর ফিরে এলে কাঁদবে। একা এই পাহাড়, সবুজ প্রান্তর আর নদীর মাঝে দাঁড়িয়ে হাড়ে হাড়ে বুঝবে একক-জীবনের জ্বালা। তখন অনুতপ্ত হবে ফেলে গেছে ভেবে। আমীরের কথা ভাবতে ভাবতে চোখের কোণে অশ্রু নেমে এল।

পা টিপে টিপে পিছন দিক দিয়ে সুলেমান এসে আমার গালে হাত দিল। চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, কাঁদছ কেন?

আমীরের জন্য কাঁদছি বললে পাছে দুঃখ পেয়ে চলে যায় এই ভয়ে বললাম, কাঁদব না, তুমি চলে গেলে কেন?

—আমার কথা বাদ দাও, তুমি কি ভাবছ তাই বল?

—বললে তুমি দুঃখ পাবে, চটে যাবে।

—আমীরের কথা ভাবছ?

—হ্যাঁ।

—আমি চটবো কেন?···তুমি নিশ্চয় ভাববে তার কথা।

আমীর আমাকে কেন ফেলে গেছে সুলেমান তা জানে না। সংক্ষেপে গুছিয়ে বললাম। কান পেতে শুনল। শুনে সুলেমান

গালাগালি দেয়নি, আমার জন্য তার দরদও উথলে পড়েনি। আজেবাজে কথা বলে আমাকে ভুলিয়ে আমার ঘুমোনোর পরে সে চলে গেল।

পরদিন এক আয়া এসে জিজ্ঞাসা করল, ক'মাস হয়েছে?

ওর কথা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি…।

আগের দিন সারারাত আমীরকে স্বপ্নে দেখলাম। সেই নির্জন প্রান্তরে আমার একক-জীবন আরও ভয়াবহ হয়ে উঠল।

তারপর আয়াকে সব বললাম। আমাকে আমীর যে প্রস্তাব দিয়েছিল তা ভাবছি…একটি ছোট্ট শিশু আমার গর্ভে আশ্রয় নিয়েছে তাকে আমি…আহা আমি আর ভাবতে পারছি না, আমি পারব না! কিন্তু পরক্ষণেই যখন ভাবলাম যে আমার গর্ভজাত শিশুকে হারালে আমি আমীরকে পাব…পাব আমাদের সেই প্রাণ-চঞ্চল জীবন…মুক্ত প্রান্তরের স্বাধীন জীবন।

রাজি হয়ে গেলাম ওর প্রস্তাবে। মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলাম। তারপর…

তারপরের তিনদিন তিনরাত্রি—আমার জীবনের অসহ্য যন্ত্রণার তিনদিন তিনরাত্রি! সেই তিনদিন তিনরাত্রি সুলেমান মুহূর্তের জন্য কাছ ছাড়া হয়নি।

সুলেমানের এ-ঋণ শোধ করব কি করে। আমাকে স্নান করাতে করাতে, আমার চুল বাঁধতে-বাঁধতে, আমার মুখে ভাত তুলে দিতে দিতে সে জিজ্ঞাসা করত, ব্যথা কমল? এক মুহূর্ত আমাকে ছেড়ে থাকত না! আর ঘন-ঘন জিজ্ঞাসা করত যন্ত্রণা কমেছে কি না। ওর সেবা-যত্ন পেয়ে মনে হল আরও দিনচারেক বিছানায় পড়ে থাকি। আমার চোখে-মুখে সামান্য একটু যন্ত্রণার ভাব দেখার সঙ্গে সঙ্গে সেও ছটফট করত, কি ভাবে আমাকে একটু সুস্থ করে তুলবে! আমি যে-পাশে ঘুরে শুতাম সেও সেইদিকে বসত। আমি ঘুমিয়ে

পড়লে আমার পায়ের কাছে মাথা রেখে ঘুমোত। কিন্তু আশ্চর্য আমি নড়লেই তার ঘুম ভেঙে যেত। আমার দিকে প্রখর দৃষ্টিতে তাকাত। ঐ ক'দিনেই সুলেমানের স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। অমন সুন্দর দুধে-আলতাগোলা গায়ের রঙ কেমন যেন কালো হয়ে গেছে! আমার সুলেমানের এ কি চেহারা হয়েছে!

সেদিন রাত্রে আমি কিছুটা সুস্থ বোধ করছি। তবে হাঁটাচলা করতে পারছি না। তবু আগের দিনের তুলনায় বেশ সুস্থ আছি। সুলেমান কলসী নিয়ে নদীতে গেল জল আনতে। ঘরে হ্যারিকেন মিটমিট করে জ্বলছে। সেই আলো-অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পেলাম ঘরে একটা লোক টল্‌তে-টল্‌তে ঢুকল। বিরাট কালো সেই চেহারা। বেশ বুঝতে পারছি লোকটা খুব মদ টেনে এসেছে। সুস্থ অবস্থায় এলে হয়ত আমার কাহিল অবস্থা দেখে ফিরে যেত। চীৎকার করে সুলমানকে ডাকলাম। তৎক্ষণাৎ সে আমার কাছে এসে তার বিশাল হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। তার ঘোড়ার মত মোটা ঠোঁট দিয়ে আমার ঠোঁটকে পিষতে চাইল। ওর সঙ্গে যোঝার মত শক্তি আমার কোথায়! জল থেকে তোলা বিড়ালের মত মিউ মিউ করলাম। ওর কবল থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করলাম। এখনও যে কেন সুলেমান আসছে না! আর সে বেচারা আসলেই বা এই রাক্ষসের মোকাবিলা করবে কী করে! হয়ত সুলেমান ঘর থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে তাকে কিছু করে আমার কাছে এসেছে। আমার জন্য কী জানি সুলেমানকে কোন্ বিপদে পড়তে হয়েছে। সুলেমানের কথা ভাবতেই কেন জানি না নিজের কথা ভুলে গেলাম। বাঁচবার আর সাধ নেই। শুধু সুলেমান যেন বেঁচে থাকে। চোখের তারা ব্যথা করছে। তারপর ঐ দানবটি আমার শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে...

কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম জানি না। সুলেমানের চীৎকারে আমার

জ্ঞান ফিরল। আবছা আলোতে দেখেছি সুলমানকে ওই শয়তানটা চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে। ওর গা-বেয়ে রক্ত ঝরছে। দাঁড়াবার চেষ্টা করে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারালাম।

আবার যখন জ্ঞান ফিরল কোন সাড়াশব্দ নেই। ঘরে কঠিন নীরবতা। আলো জ্বলছে। সুলেমানকে নিয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়তেই আবার মাথা ঘুরল। আহা! সেদিন রাত্রের যন্ত্রণা যেন মৃত্যু যন্ত্রণাকে হার মানাল। ভাবলাম বেশ হয়েছে! সুলেমান আমার জন্য কত কষ্ট ভোগ করেছে। আমার জীবনদান করার জন্য সে নিজের জীবনকে তুচ্ছ মনে করেছে—তার এই ভালবাসার প্রতিদান আমি তাকে কতটুকু দিতে পেরেছি। তারই পাপ।

আমার চারদিকে রক্ত! যেদিকে পাশ ফিরি চপচপ করছে রক্ত। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। উঠে জল খাওয়ার শক্তি নেই। আমার সুলেমান গেল কোথায়! সুলেমানকে কোথায় নিয়ে গেছে! আবার চোখের সামনে ভাসল সে সুলেমানকে নিয়ে যাচ্ছে! রক্তঝরছেওর গা বেয়ে! ওই শয়তানটার হাতে তো ছোরা ছিল। ভাবতেই গা শিউরে উঠল। হয়ত আমার সুলেমানকে সে কোন পাতকুয়ায় ফেলে দিয়েছে। গর্ত করে পুতে রেখেছে! ছটফট করছি। কি করি। একটু যদি উঠতে পারতাম। এই সময় যদি আমীর আসত! বলে কয়ে তাকে পাঠাতাম সুলেমানকে ডাকতে। বেচারা সুলেমান! তার মা হয়ত খবর পেয়ে কান্নাকাটি করছে—আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি নিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম কিন্তু সব বৃথা। থপ করে মাটিতে পড়ে গেলাম।

কি দারুণ তৃষ্ণা! আর বাঁচব না। জল···একটু জল। কাপড়টা রক্তে ভিজে গেছে। সেই রক্তে জড়িয়ে আছে একটি শিশু। চোখ তার ফোটেনি। চোখ বুজে আছে। হাতটা

গুটিয়ে পুঁটলীর মত দলা পাকিয়ে পড়ে আছে। আমার আমীরের সন্তান! ওর দিকে তাকাতেই ভয় করল। যদ্দুর দৃষ্টি যায় সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, পাহাড়, আকাশ আর মাটি। সেখানে আমরা দুটিতে পড়ে আছি। এক সেই শিশু আর আমি। শিশুটি যদি নড়েচড়ে ওঠে, যদি হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে···

তাইতো! এই তো সুলেমানের পায়ের শব্দ। একটু মাথা তোলার চেষ্টা করে বললাম, এসেছ? আমার সুলেমান এসেছ? আগে বল তোমার কী হয়েছে?

বাইরে থেকেই বলল, আমার কথা বাদ দাও, তুমি কেমন আছ বল?

তারপর ঘরে ঢুকে রক্তের মধ্যে আমাকে পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার করে বলল, কী হয়েছে তোমার? তোমাকে সে কি করেছে?

—কিছু করেনি। আর সে আসেনি।

—আসেনি তো! তাহলে এই রক্ত কিসের?

লজ্জা পেয়ে বলিনি। কয়েক মূহূর্ত পরে বললাম, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে...আমাকে একটু জল দাও।

আমাকে জল খাইয়ে স্নান করাল। আমার অন্য কোন শাড়ী নেই। চাদরটাই জড়িয়ে নিলাম।

সুলেমানের কাণ্ড দেখে হঠাৎ চিৎকার করে বললাম, ওকিকরছ? সুলেমান ওই ছোট্ট শিশুটিকে কাপড়ে বাঁধছে!

—ফেলে দিয়ে আসব।

—তুমি নিজের হাতে একাজ করবে?

—কোন কথা বল না।

তারপর সে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলে বললাম, কোথায় ফেলে দিয়ে এলে?

—তুমি খুঁজে পাবে না।

আমার আমীরের সন্তানকে আমি আর খুঁজে পাবনা। ...

—সে তোমাকে নিয়ে গিয়ে কি করল বললে নাতো? কি ঘটেছে আমি কিছুই জানি না। আমি বললাম।

—নদী থেকে ফিরেই আমি ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিলাম। তারপরেই সে আমাকে নিয়ে গিয়ে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে দিল। আমাকে বাঁধার পর গর্জে উঠে ওকে বলে ছিলাম, আবার যদি ওর কাছে যাও তাহলে তোমাকে আস্ত রাখব না! ওকে বলেছি বটে কিন্তু আমার মনে হল আমার মত একটি ছেলের কথায় লোকটা অত গুরুত্ব দেবে কেন! নিশ্চয় সে আবার তোমার কাছে ফিরে এসে...এই সব সাত-পাঁচ ভেবে ছটফট করে উঠলাম। তাই ওর ফিরে যাওয়ার পর থেকে দাঁত দিয়ে নখ দিয়ে দড়িটাকে কেটে কেটে এতক্ষণে তোমার কাছে ছুটে আসতে পেরেছি।

তা-ই সুলেমানের মুখেও রক্ত! ওর নরম হাত কেমন যেন পিষে গেছে। আমি তার হাত ধরে বললাম, এত যন্ত্রণা সহ্য করলে কেমন করে সুলেমান! সে আমার হাতে তার ঠোঁট রাখল। আমি তাকে আরো কাছে টেনে নিলাম। ভোর হয়ে এসেছে। পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তবু আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে পড়ে ছিলাম।

আমাদের ঘুম ভাঙল মধ্যাহ্নে।

॥ সাত ॥

সুলেমান আমীরের কাছে খবর পাঠিয়েছে আমার হয়ে। কিন্তু আমীর আসবে ভাবতেই অজানা এক আশঙ্কায় আমার বুকটা ধক্ করে ওঠল। মনে হয়েছিল সে না ফিরলেই বুঝি ভাল হত। ও

ফিরলেইত সব ওলট-পালট হয়ে যাবে। আমার সঙ্গে সুলেমানের যে মধুর সম্পর্ক, স্বপ্নলিপি দিনের পর দিন রচিত হচ্ছে তা বোধহয় তছনছ হয়ে যাবে।

আমীরের প্রতি নিবিড় ভালবাসায় চিড় ধরল। একই সময়ে দু'জনের প্রতি একটা টান অনুভব করলাম। এক একটা বিষয়ের দিক দিয়ে এক একজনের প্রতি টান। এটা হয়ত তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না। কেন হয় এসব, কি করে হয়, তোমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে। তোমরা এটাকে পাপ বলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে আমাকে ভ্রষ্টা বলবে। কেতাবি বুলি আওড়ে আমায় উপদেশ দেবে। কিন্তু আমার অনুভূতি, আমার অভিজ্ঞতার মূল্য সবচেয়ে বেশী!

আশ্চর্য, মাত্র এক হপ্তা আগেই না আমীরের জন্য আমার মনপ্রাণ উথলে উঠেছিল! আমিও মনেপ্রাণে চেয়েছিলাম সে ফিরে আসুক। সেই মুহূর্তেই ফিরে আসুক। কিন্তু এর মাঝের যে তিন দিন তিন রাত্রি আমাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে! সুলেমান যে এক মুহূর্ত ছেড়ে যায়নি আমাকে— সেই তিন দিন তিন রাত্রি। আমি তার সান্নিধ্য পেয়েছি। পেয়েছি উত্তাপ। নতুন ভাবে বাঁচার স্বাদ খুঁজে পেয়েছি তার পরিচর্যার ফলে। এক মুহূর্তের জন্য সে বিরক্তি প্রকাশ করেনি। ইচ্ছে করল আবার যদি শয্যাশায়ী হই আবার সুলেমানের সাহচর্য পাব। সে আবার প্রমাণ করার সুযোগ পাক সে আমায় কত নিবিড় ভাবে ভালবাসে।

কিন্তু ওর ঋণ শোধ করব কি করে।

একদিন রাত্রে সুলেমানকে ডেকে হাত ধরে সামনে বসালাম। বললাম, সুলেমান সত্যি কি তুমি আমায় চাও?

বোবা দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকাল।

—সেদিন দুপুরে···না থাক।

ওর হাত আমার হাতের মুঠোয়। ওর আঙুলগুলোর ছোঁয়ায়, তার রক্তাভ সলজ্জ মুখ দেখে বুঝলাম ও কি বলতে চায়।

—ইচ্ছে থাকলে আজ রাত্রেই তুমি আমাকে পেতে পার।

—তুমিও কি চাও আমাকে ?

—চাই।

আমার লজ্জা করল। সুলেমান বলল, আজ না হয় চাই বলছ, আমীর ফিরে আসলে, তখন কি করবে ?

কথাবার্তার মধ্যে সে একটা স্বাভাবিক সৌজন্য বজায় রেখেছে। অগত্যা তাকে কাছে টেনে নিয়ে চুমো খেয়ে টেনে নিলাম আরও কাছে। তার নরম আঙুল আমার চুলে আকুলিবিকুলি করছে। বললাম, তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলব না। আমীরের জন্য আমার মন অনচান করে ভেবেই না তুমি আমাকে ভালবাসতে পার না ? সত্যি কথা বলতে কি জান আমিতো মহৎ নই, তুমিত জান আমি ধোয়া তুলসী পাতা নই।

—তাহলে ও প্রশ্ন করলে কেন ?

ওর কথা শুনে আমার লজ্জা পেল।

—তোমাকে খুশী করতে। হতে পারি আমি আমীরের। কিন্তু আমার মন তার চেয়ে তোমাকেই বেশী চায়।

তারপর অন্য প্রসঙ্গ টেনে দু'চার কথা বলে সে চলে গেল। ভাবছি এবার কি সুলেমানকে নিয়ে ঘর করব! সত্যি এমন হল কেন!

অন্যদিন সুলেমান এসে বলল, আমীর যদি এসে পড়ে ?

—আসুক না।

—আমার ভয় করছে।

—কিসের ভয় ?

আমি বুঝেছি ভয়ের কারণ। তবু প্রশ্ন করেছি তাকে। সুলমান বলল, আমীর হয়ত রাজি হবে না।

—গররাজী হবে কেন?

এবারেও প্রশ্ন করেছি বটে। কিন্তু আমি জানি তার কারণ। সুলেমান বলল, আমাদের এ সম্পর্ক আমীর সহ্য করতে পারবে না।

—এতে দোষ কি?

—দোষ হয়ত নেই। কিন্তু সে কি মনে করবে।

—তার কি চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছে! ওটুকু ভেবে দেখবে না।

—আমার কিন্তু সত্যি খুব ভয় লাগছে।

—আমিত আছি ভয় পাচ্ছ কেন? আমীর যদি তোমাকে কিছু করতে চায় আমি বাধা দেব। আমীর কি আমার কথা রাখবে না?

—নিজের কথা ভাবছি না। নিজের জন্য আমার ভয় নেই। আমাকে যা ইচ্ছে সে করুক। ভাবছি তোমার কথা।

—আমাকে কিছু করবে না।

—তুমি ওকে চেন না।

—খুব যে বুড়ো-বুড়ো কথা বলছ। আমার চেয়ে কি তুমি ওকে বেশী চেন? এমন ভাবে কথা বলছ যেন আমার চেয়ে বয়সে তুমি অনেক বড়।

—তোমার কি ধারণা যে আমি জগৎ সংসারের কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না! আমীরকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। আর বয়সের দিক দিয়েও তুমি আমার চেয়ে এমন কিছু বড় নও।

সত্যি তাই। সুলেমানের চেয়ে বয়সে আমি এমন কি বড়। সুলেমান বলল, আমাদের মুসলমানদের খবর তুমি কতটুকু জান?

চুপ করে রইলাম। সেই মুহূর্তে যে সম্পর্কেই ভাবি না কেন ঘুরেফিরে সেই একটি চেহারা ভেসে উঠেছে—রক্তচক্ষু নিয়ে আমীর

আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সুলেমানও হাঁটুতে মাথা গুঁজে কি যেন ভাবছে। কিছুক্ষণ পরে আমার পিঠে হাত দিয়ে বলল, আমীর যদি তোমার গায়ে হাত দেয় আমি সহ্য করতে পারব না। তোমাকে একা ফেলে আমি পালাতে পারব না। আমার জন্য তোমার দিকে যদি তর্জনীও দেখায় আমি তার আঙুল কেটে ফেলব। তার বুকে ছোরা বসিয়ে দেব।

অনেকক্ষণ রা করিনি। একদৃষ্টিতে সুলেমানের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তার চোখ জ্বলছে। স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে বেরোচ্ছে। গালগুলো যেন দাউ-দাউ করে জ্বলছে। তার গালে কে যেন আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে। আমার সুলেমানের মধ্যে কী পৌরুষ!

—কথা বলছ না কেন? এরই মধ্যে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও না। আমার মুখ দেখতে ভাল লাগছে না?

সুলেমানকে কি করে জানাব মনের অবস্থা।

—কথা বলবে না ত? বলেই উঠে চলে যেতে যেতে বলল, আমীর আসার পর আর আমি আসব না।

—তুমি না আসলে আমীরকেও আমি চাই না।

—চাও না কেন? তুমি চাই না বললে আমীর কি তোমাকে ছেড়ে দেবে?

ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি করে আমার শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করলাম। আমার চোখে জল এলো। বললাম, সুলেমান তুমি কি আমাকে ছেড়ে যাবে?

—আমীর যদি ক্ষেপে গিয়ে তোমাকে কিছু করে বসে?

—ওকথা এখন রাখ। যখনকার কথা তখন দেখা যাবে।

॥ আট ॥

আমীরের ফেরার দিন সুলেমান ছিল না। ঘরে ফিরেই সে আমার দিকে আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। সলজ্জ ভাব নিয়ে সামান্য একটু বেঁকে দাঁড়ালাম। আমার কোমর জড়িয়ে ধরে মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আগের চেয়ে তোমাকে এখন ভাল দেখাচ্ছে। তোমার চোখেমুখে ঝিলিক দিচ্ছে।

সেই তার প্রথম কথা। আমি ভেবে ছিলাম তার জন্য আমি যে ত্যাগ স্বীকার করেছি, তাতে সে আমাকে পঞ্চমুখে প্রশংসা করবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। ব্যথা পেলাম। তু'একবার চেষ্টা করলাম তার অনুপস্থিতিতে যে কষ্টে কেটেছে তা উত্থাপন করার।

আমীর চার মাস ছিল না আমার কাছে। কি করে যে এই চার মাস কেটেছে—ভেবে পাইনি। মনে হচ্ছে যেন তুজনে অনাদিকাল থেকে, ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রথমক্ষণ থেকে আমরা সেই ভাবেই আছি। মনে হল, আমরা তুজন না থাকলে জগৎ-সংসার কিছুই থাকবে না—এই সুন্দর পাহাড়, আদিগন্ত সবুজ মাঠ—নদী—আর ঐ নীল আকাশ কিছুই থাকবে না। আমীর বলেছিল, আমরা না থাকলে এই কুঁড়েঘর দখল করবে শেয়াল আর কুকুর। আমার মুখে কথা ছুটে এসেছিল, আমরা থাকব না কেন?

আগের মতই আমরা এক হপ্তা কাটালাম সানন্দেই। কিন্তু মাঝে মাঝে মধ্যরাত্রেই আমরা যখন জ্যোৎস্না রাতে বেড়াতাম, হিমেল হাওয়ায় আমীর যখন গান গাইত তখন বিদ্যুতের মত আমার মনে পড়ত সুলেমানের কথা! তাইত সুলেমান এখন কোথায়, ও আসে না কেন!

আমীর ঐ চার মাস যে কোথায় ছিল কি করছিল কিছুই বলল না। আমার যে সেই চার মাস কিভাবে কেটেছে তাও চাইল না জানতে। সব সময় অজানা আশঙ্কায় বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করত। পাছে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে! কিন্তু করেনি বলেও অশ্বস্তি বোধ করেছি।

হপ্তা খানেক বাদে চাল কিনে আনতে আমীর শহরে গেল। ঘরের বাইরে পা রাখতে-না-রাখতেই সুলেমান এসে মাথা নীচু করে আমার সামনে দাঁড়াল।

—একি সুলেমান এতদিন তুমি ছিলে কোথায়?

টপ্ টপ্ করে চোখ দিয়ে জল গড়াল তার।

—কি হয়েছে বল না, সুলেমান?

—আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক কি শেষ?

—কিসের সম্পর্ক?

আমি জানি তবু জিজ্ঞাসা করলাম।

—তুমি জাননা?

—এসব কথার কোন মানে হয়? তুমি মিছেমিছি আশঙ্কা করছ।

ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছি বটে কিন্তু নিজে অনুভব করছি আমার মনে একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

—আমি এই যন্ত্রনা সহ্য করতে পারছি না।

—কিসের যন্ত্রনা? কেন?

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। নিজেকে অনেকবার প্রশ্ন করেছি, উত্তর পাইনি। কিন্তু তবু অসহ্য লাগছে, এইটুকু বুঝি। কী কথা বলছ না কেন...গত তিন দিন এই ঘরের পাশের বনে লুকিয়ে ছিলাম। সারারাত সারাদিন নজর রেখেছিলাম ঘরের দিকে ...

বেচারা সুলেমান!

—সে কী, এই তিনদিন তুমি সেখানে ছিলে! ঘরে এলে না কেন? নিজের আনন্দেই ডুবে গেছি তা নয়। আমি যে কিভাবে তোমার ঋণ শোধ করব—কতবার ভেবেছি। কিন্তু...

তাকে কাছে টেনে নিয়ে চুলে হাত বুলোলাম।

—বেশ বুঝতে পারছি। তোমার জীবনে আমার কোন প্রয়োজন নেই। এটাই সত্য...অস্বীকার কর না...আমি বেশ লক্ষ্য করছি তোমার মনে আমার কোন স্থান নেই।

—সুলেমান, তুমি যে একথা বলবে আমি তা কল্পনাও করতে পারিনি। আমীরকে আমি আগের মত ভালবাসি বলেই তো তোমার এত ব্যথা? তোমার প্রতি আমার ভালবাসা থাকবে না কেন? কোনদিন কি সেকথা বলেছি।

—ছি, সে কথা ত আমি কোনদিন ভাবিনি। আমি বলছি এই ঘরে আমার ঠাঁই নেই, তোমার হৃদয়েও আমার কোন...।

—আছে! কোনদিন তা হারানোর নয়। এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

—সত্যি, সত্যি বলছ?

—হ্যাঁ। এ ধরণের আজেবাজে সন্দেহ আর কোনদিন কর না! ...চল ফুল কুড়িয়ে আনি।

তারপর আমরা দুজনে ছুটেছি ফুলবাগানে। ছুটেছি বটে কিন্তু মন আমার ভার ভার।

—ফুলগুলো আমার খোঁপায় গোঁজ।

—যাতে আমীরের কাছে তোমাকে সুন্দর দেখায়?

কি উত্তর দেব ভেবে পাইনি। কিছুক্ষণ ভেবে বললাম, একথা বল না, তোমাদের দুজনের কাছেই যাতে সুন্দর...

খোঁপায় ফুল গুঁজে দিল। সুলেমানের রক্তে খরস্রোত। আমার ঘাড়ে হাত বুলোচ্ছে। সাপের বাচ্চাকে দুধকলা দিয়ে পুষছি, সুযোগ

পেলে ত ছোবল মারবেই। এইভাবে ঘণ্টাখানেক বোধ হয় কেটেছে। আমীর এল।

—সুলেমান, কখন এলে? বলেই আমীর ঘরে ঢুকে উনুন ধরালো। আর আমাদের দিকে আসেনি। সুলেমান কোন এক বিদেশী সওদাগরের গল্প করছিল। কিছুক্ষণ পরে আমীর একটু দূরে বসল। সুলেমানের গল্প থেমে গেল। সবাই চুপ করে বসে আছি। আমরা গুটি খেলি। হঠাৎ কি ভেবে সুলেমান উঠে চলে গেল। দীর্ঘ ছুটি ঘণ্টা আমীর আমার সঙ্গে কোন কথা বলল না। ওর চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে গুমোট আকাশে কাল মেঘ ঘনিয়ে আসছে, কিছুক্ষণ পরে মেঘ গর্জন শোনা যাবে, বৃষ্টি হবে মুষল-ধারায়।

—আচ্ছা সুলেমান ওরকম করে কেন?

—আমি কি করে জানব।

—ডেকে পাঠাতে পার আর এটা জান না?

তারপর তুদিন সুলেমানের দেখা নেই। আমীর যেন নতুন করে আমায় ভালবাসতে সুরু করল। আমিও যেন সুলেমানকে ভুলে বসেছি। মাঝে মাঝে আমীর অবশ্য আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাত। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গোটা শরীর আর আমার হৃদয় যেন পরীক্ষা করার চেষ্টা করত। কিন্তু পরমুহূর্তেই ছট্‌ফট্‌ করত। ওর মানসিক ব্যথা-বেদনার অংশীদার হওয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু কোনদিন মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করিনি সে আমায় সন্দেহ করে কি না জিজ্ঞেস করতে ভয় করত। কি জানি কি বলতে কি বলে ফেলব। তাইত, সুলেমানকে যে একেবারে ভুলে গেছি! কোথায় আছে এখন সে! আবার কোন ঝোপ-ঝাড়ে হয়ত মশার কামড় খেয়ে পড়ে আছে। আসলেও ত পারে। আসে না কেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভুলে যেতাম। আচ্ছা ভুলে যাই কেন! কি করে ভুলি।

আমি কি নিষ্ঠুর! পাথুরে মন আমার। আমার কী অধিকার আছে সুখে থাকার। নিজের অজান্তেই ঠোঁট কামড়াতাম। কি অকৃতজ্ঞ আমি। কিন্তু এখন ওর কথা ভেবে কোন লাভ আছে? তোমরা শাস্ত্রের দোহাই পেড়ে বলবে, তোমার দুর্ভাগ্য। তোমাকেই ভুগতে হবে। আমি বলব, দুর্ভাগা তোমাদের, এখন যেতে পার।

সন্ধ্যায় আমি আর আমীর নদীর ধারে বেড়াতে যাচ্ছি। পথে ছোট্ট এক টুকরো লাল কাপড় দেখে থমকে দাঁড়ালাম। আমি জানি ওটা সুলেমানের জামারই টুকরো। ওটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু কাঁপল। মনে হল সুলেমান মরে গেছে আর এই চিহ্নতেই নিজের মৃত্যু সংবাদ জানাতে চেয়েছে। সুলেমানের ছবি চোখের সামনে ভাসল। মনে হলো সে আশেপাশেই আছে। চারদিকে তাকালাম। হঠাৎ শুনি, দূর থেকে ভেসে আসছে সুলেমানের কণ্ঠস্বর। সে বলছে, তুমি যতক্ষণ না একা আসবে, ততক্ষণ আমি বসে থাকব এখানে।

কতদিন ধরে সেখানে বসে আছে কে জানে। আশ্চর্য মানুষ সুলেমান। কী দুর্ভাগ্য সুলেমানের। চোরের মতন আমার সঙ্গে তাকে দেখা করতে হচ্ছে। ওর জন্য দুঃখ হল। দুঃখটা গলার কাছে যেন দলা পাকিয়ে গেল। হাত তুলে ইশারা করে আবার আমীরের পিছনে পিছনে হাঁটলাম!

রাত্রে আমীরকে উনুনের কাছে বসিয়ে, আসছি বলে নদীর তীরের দিকে হাঁটলাম। কোত্থেকে সুলেমান এসে আমার সামনে হাজির হল।

—এ কি সুলেমান, তুমি এভাবে এখানে?

—একটু ওদিকে চল, অনেক কথা আছে।

—এক্ষুনি ফিরতে হবে। আমীর যে খুঁজবে!

—খুঁজুক, সেজন্যেই বলছি এখান থেকে অনেক দূরে চল, সেখানে কথা হবে।

—দেরী হলে যদি কারণ জিজ্ঞাসা করে?

—ভয় পাচ্ছ ত?

—ভয় আবার কিসের?

—আমি'ত আগেই বলে ছিলাম। আমি যা ভেবেছি ঠিক তাই ঘটছে। আমি জানতাম তুমি ভয় পাবে। ক্রমশঃ আমাদের কথা বলারও সুযোগ থাকবে না।

—ওর কাছে গোপন করার কি আছে? মিছামিছি ওর মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে কোন লাভ আছে?

—সন্দেহ কিসের? বলবে, আমি সুলেমানের সঙ্গে গিয়েছিলাম।

—তাকে না জানিয়ে, তার অজান্তে এভাবে দেখা সাক্ষাৎ করে লাভ কি বল?

—বেশ ত লাভ যদি না থাকে এস না আমরা দুজনে থাকি।

—কেন থাকব?

—তাহলে কি আমার সঙ্গে কথা বলবে না?

—বলব না বলিনি ত! আমাদের ঘরে এস।

—কেন? এভাবে আমার সঙ্গে বেড়াতে অসুবিধা আছে?

—সেও থাকুক না আমাদের সঙ্গে।

—নাই বা রইল।

আর কথা বলতে পারলাম না। আমীরকে দেখলে যে আমার ভয় করে তা স্বীকার করতেও আমার ইচ্ছে করছে না।

—খুলে বললেই হয়, আমাকে তোমার ভাল লাগে না।

—সুলেমান?

—তাহলে আমীর আমাকে ভালবাসে না। তুমি ভয় পাও সে কথা স্বীকার করতে।

কিছুক্ষণ ভেবে বললাম, দেখ সুলেমান তোমার সঙ্গে যে কি ভাবে কথা বলব ভেবে পাচ্ছি না। তুমি'ত কোন অন্যায় কর নি, চুরি-চামারিও করনি। আসবে না কেন ঘরে? আগের মতই আসবে, সকলের সঙ্গে কথা বলবে, আমীরও তোমার কাছে নতুন মানুষ নয়, আমার চেয়ে আগে তোমার পরিচয়। আমি চাই তোমার আর ওর সঙ্গে বেড়াতে। ঘরে এসেইত ডেকে আনতে পার। এখন সে আমাদের সঙ্গে নেই, যদি আমার উপর সন্দেহ করে সেটা কি তার অন্যায় হবে?

—সে সন্দেহ করার কে?

—যেই হোক্, সন্দেহ সে করবে।

—তোমার তা সহ্য হবে?

আমি চুপ্ করে রইলাম। পুরানো প্রশ্ন আবার করলাম, তুমিই বা আমাদের ঘরে আসবে না কেন?

—আমার ভাল লাগে না, তার ও ভাল লাগবে না! সবচেয়ে বড় কথা, আমি অনুভবই করতে পারি না যে তুমি আমার পাশে আছ।

—নতুন নতুন তা হবে। দু'চার দিন যাতায়াত করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

সে কোন কথা বলল না। মনে মনে আমিও বুঝছি আমার কথা মিথ্যা। দুজনের কাউকেই ছাড়তে পারি না। দুজনকে একত্র করতে পারিনি। সেটা আমার শক্তির বাইরে।

তবু মনের বিরুদ্ধে বললাম, সে যাই হোক্, তোমাকে আসতেই হবে। আমরা তিনজনে সুখে থাকব।

মুখে বললে কি হয়, হৃদয় আমার ওসব কথায় সায় দিচ্ছে না। মন যে-কথা বলতে চায় না সেকথা আর কতবার বলব। সুলেমানের করুণ অসহায় মুখের দিকে আর তাকাতে পারছি না।

গোধূলি বেলার সোনালী আলো সুলেমানের মুখে পড়ছে। হাওয়া যেন মুঠো-মুঠো অন্ধকার ছড়িয়ে যাচ্ছে।

অন্ধকার আরও ঘনীভূত হল। সুলেমান বলল, চলে যাবে?

—আর তুমি?

—আমি···আমি এখানেই থাকব।

সেই নদীর ধারে, অন্ধকারে আমার স্মৃতি রোমন্থন করা কী দুঃসহ। কী কঠিন সাধনা। ওর সামনে দাঁড়ানোর নৈতিক অধিকার আমি হারাচ্ছি। কাছে টেনে নিয়ে বললাম, সুলেমান ভেতরটা যে তোমার কুরে যাচ্ছে। দাউ দাউ করে জ্বলছ! তুমি···সত্যি···তোমাকে নিয়ে যে কি করি।

ডুকরে ডুকরে কাঁদলাম। ইচ্ছে করল আমীরকে ছেড়ে ওর সঙ্গে চলে যাই কোথাও। বেচারার কচি মনে কত বড় আঘাত দিয়েছি। আমাকে সে কত গভীর ভাবে বিশ্বাস করে। আমার জন্য সে সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। কি করে তার ঋণ শোধ করব।

সুলেমান, তুমি না থাকলে আমি বাঁচতে পারব না। কিন্তু আমি যে কি করব তা ভেবে পাচ্ছি না। তার গায়ে হেলে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

—আমীরকে ছেড়ে দুজনে কোথাও চলে যাব? মন থেকেই এ প্রশ্ন করেছিলাম তাকে। এখন সে-কথা মনে পড়লে মন আমার খান্-খান্ হয়ে যায়। কিন্তু তখন আমার সেই কথায় সুলেমানের মন নাড়া খেল।

মেয়েমানুষের ত্যাগ পুরুষরা সহজে গ্রহণ করতে পারে না। আমার এই ত্যাগের কথাই যথেষ্ট। পতিব্রতাদের বহু ত্যাগের দৃষ্টান্ত পৌরাণিক গাথায় জ্বলজ্বল করছে। সে-ধরনের ত্যাগ গ্রহণ করতে কিন্তু আমীর বা সুলেমান প্রস্তুত নয়। এরা মর্ত্য-প্রেমিক। ওসব এরা স্বীকার করে না।

—কাল থেকে আমি তোমাদের ঘরে যাব।

—সত্যি আসবে?

দুজনই আমাদের কুঁড়ে ঘরের দিকে তাকালাম। সুলেমান বলল, কাল ঐ ঘরে আমরা পাশাপাশি বসব। তোমার কাঁধে হাত দিতে পারব?

—নিশ্চয়। একথা আবার জিজ্ঞেস করতে হবে।

—তখন কিন্তু আমীর দেখলেও আমি তোয়াক্কা করব না।

—দেখুক না।

বলছি বটে কিন্তু প্রতি মুহূর্তে মন যেন আমার টুঁটি টিপে ধরছে। সুলেমান যদি সত্যি সত্যি তাই করে কি ঘটবে কে জানে। যা হয় হোক্। এদিক-ওদিক তাকালাম। একি সুলেমান গেল কোথায়! আশ্চর্য!

ঘরে ফিরে গেলাম।

পরদিন সুলেমান যখন আমাদের ঘরে এল তখন আমীর চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। সুলেমান কোন কিছু তোয়াক্কা না করে সোজা আমার সামনে বসে বলল, আমি যে চিরুণীটা দিয়েছিলাম সেটা কোথায়?

বেচারা আগের মতই স্বাভাবিকভাবে কথা বলার চেষ্টা করছে।

—চিরুণীর আর কি দরকার? আমীর ত আছে, সেই আমার জট খুলে দেবে। তার আঙুলগুলোই ত চিরুণীর কাজ করে।

কথাটা বলেই আমীরের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। পরক্ষণেই সুলেমানের দিকে তেরছা দৃষ্টি হেনে মুচকে হাসলাম। কি করুণ আমার অবস্থা। সরু একটা দড়ির উপর দিয়ে হাঁটছি—দুপাশে দুটি যেন সমুদ্র। কোন্ কথা বললে, কোন্ কথা না বললে কে রেগে যাবে কি অর্থ করবে সবই ভেবে চিন্তে করতে হচ্ছে। এও এক যন্ত্রণা। প্রেম যে জীবনকে কুরে কুরে খেতে পারে তা আগে

জানতাম না। প্রতিটি পদক্ষেপ যেন ক্ষুরধার তরবারির উপড় পড়তে পারে!

আমীর গম্ভীরভাবে আমার দিকে একবার তাকিয়ে চুপ করে গেল। সুলেমান একনাগারে বক্‌বক্‌ করে যাচ্ছে।

আমীর চুল বেঁধে দেওয়ার পরেই সুলেমানকে নিয়ে সরে বসলাম। আমীর দূরে বসে কঁ্যাচকঁ্যাচ করে একটি ছোরা সান দিচ্ছিল। প্রতি মুহূর্তে আমার ভয় করছে, এই বুঝি সুলেমান আরও আমার গা-ঘেষে বসল! কিন্তু আমীরের ঐ তীক্ষ্ণ তীব্র জ্বলন্ত চাউনি দেখে সুলেমানের সে সাহস হল না। আমি ঐ নিস্তব্ধতা আর সহ্য করতে না পেরে বললাম, চল স্নান করতে যাই!

কেউ উঠল না। না সুলেমান, না আমীর।

—সুলেমান তুমি চল।

সুলেমান বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়িয়ে আমীরের মুখের দিকে তাকাল।

—আমীর, তুমি নড়ছ না কেন?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আমীর বলল, যাচ্ছি, যাও। তারপর গোমড়া মুখে আবার ছোরাটা সান দিতে লাগল।

আর কোন কথা বলবার ছিল না, শোনবারও না। আমরা দুজনে পা বাড়ালাম। বেশ কিছু দূরে গিয়েও পিছনের দিকে তাকিয়ে আমীরের নাগাল পাইনি। উচু জায়গায় দাঁড়য়ে দেখি মধ্যাহ্নের রোদ মাথায় করে আমাদের ঘরটা যেন পুড়ছে। সুলেমান বলল, ওদিকে তাকিয়ে লাভ নেই। আমি নিশ্চুপ।

—আমীর থাকলে তোমার সঙ্গে যেন ঠিক প্রাণ খুলে মিশতে পারি না।

কি বলব ভেবে পাইনি। কিছুক্ষণ পরে বললাম, প্রাণ খুলে নাইবা মিশলে।

সুলেমান কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, তাতো বটেই, তোমার আর কি ?

'তোমার আর কি' কথাটা তার মুখ দিয়ে এমনভাবে উচ্চারিত হল যেন সুলেমান নিরাশ হয়েছে, হয়েছে ক্ষুন্ন। এবং হতাশায় ভেঙে পড়ছে।

—সুলেমান, বাজে কথা বলো না। এই তুমি বুঝলে এতদিনে। আমরা পরস্পরকে কত নিবিড়ভাবে ভালবাসি…

সুলেমান যেন আবার ভাবতে বসল। সেই কচি বয়সে বেচারা কী সমস্যায় না পড়েছে। চোখ বুজে ভাবছে ত ভাবছেই। ওর ঐ অবস্থা দেখে আমার কষ্ট হয়।

—সত্যি কথা বলতে কি, আমীর আমাদের ভালবাসার মধ্যে মস্তবড় এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাব্বা ! সুলেমান কিসব চিন্তা করছে। ওর কথাগুলো বুঝে লজ্জা পেলাম। কোন জবাব না দিয়ে ঘরের দিকে হাঁটা দিয়েছি। সুলেমান পিছনে পিছনে আসছে।

আমীর তখনও ছোরায় সান দিচ্ছে। বসলাম। আবার সেই অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা। অনেক্ষণ বসে আছি। কারো মুখে কোনো কথা নেই। শেষে আমি ভাত খেতে ডাকলাম আমীরকে। সঙ্গে সঙ্গে সুলেমান এমনভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল যেন তাকে চলে যেতে বলেছি।

নিজের ভুল শুধরে নেওয়ার জন্য বললাম, সুলেমান, তুমিও খাবে এস।

সেই মুহূর্তেই মনে প্রশ্ন জাগল। তাইত সুলেমানকে খেতে দেব কিসে ! আমাদের সম্বল মাত্র একটি হাঁড়ি। ঐ হাঁড়িতেই রান্না হয় আর তাতে আমি এবং আমীর খাই।

আমীরের অনুপস্থিতির দিনগুলিতে অবশ্য আমি আর সুলেমান

খেয়েছি। আজকাল আবার আমি আর আমীর খাচ্ছি। ঐ হাঁড়ি ছাড়া আর কোন পাত্র নেই ঘরে। এখন কি করি। সমাধান না খুঁজে পাওয়ায় অস্থিরতায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। তুজনেরই প্রাশ্নিক দৃষ্টি আমার ওপর নিবদ্ধ।

—বস, তিনজনই খাব।

আমীর নড়ল না, সুলেমানও না, তিনজনে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম তার ঠিক নেই। আমার তন্ত্রীগুলো তুর্বল হয়ে পড়ছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। কি করব ভেবে পাচ্ছি না। মাথায় কোন বুদ্ধি খেলছে না।

চপলতার সঙ্গে বললাম, তোমরা তুজনে বাচ্চাদের মত হাত পেতে বস। আমি দলা পাকিয়ে তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। কী, বসছ না কেন? তাদের দিকে আর না তাকিয়ে ভাতের হাঁড়ি আর চাটনি নিয়ে এলাম।

—আগে আমার হাতে দেবে তারপর আমীরের হাতে।

—আমি পরে খাব। আমীর মাথা নীচু করেই ছুঁড়ে দিল কথাগুলো আমার দিকে।

পরাজয় স্বীকার করে ঢোঁক গিলে বললাম, সুলেমান, তুমিও কি আমার কথা শুনবে না।

ওর হাতে কয়েক দলা দিয়ে আমিও তুমুঠো খেয়েছি। আমীরকে খেতে দিতে গেলে সে কঠিন কণ্ঠে বলল, রাখ ওখানে···তুমি খেয়ে নাও।

সুলেমান আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন সে বলতে চাইছে, দেখলে ত যতই হোক তোমার কাছে আমিই পর।

ভাতের হাঁড়িটা ফেলে রেখে বাইরে এসে বসলাম। আমীরের দিকে এমনভাবে তাকালাম যাতে সে বুঝতে পারে যে আমি বিরক্তিত। আমীরের চোখেমুখে একটা কঠিনভাব ক্রমশঃ দানা

বাঁধছে। একটা অস্বস্তিকর অশান্তিকর আবহাওয়া যেন আমাদের ঘিরে রয়েছে। হঠাৎ বললাম, সুলেমান, চল, ঐ গাছের নিচে বসি। বলতে না বলতেই সে উঠে দাঁড়াল।

আমীর মাথা তুলে আমার দিকে একবার দেখল। চাউনিতে —সে যেন বুঝিয়ে দিতে চায় যে সে কিছু টের পেয়েছে! কি যে করি। সুলেমানকেত আমিই আসতে বলেছি! যেতে বলি কি করে। কথায় কথায় সুলেমানের কাঁধে হাত দিলাম, ঘুম-ঘুম চোখ তার। গায়ে তার হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমি ঠায় বসে বসে ভাবছি।

দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার পর রাত্রি এল। তখনও সুলেমান ঘুমিয়ে। আমি ঘরের ভিতরে। সুলেমান ঘরের বাইরে। গাছের পাতা নড়লেও মনে হয় সুলেমান উঠে পড়ে আমায় খুঁজছে। মাঝে-মাঝে কা-কা-কা ডাক শুনে আমার ঘুম ভাঙে। মনে হয় সুলেমানই সেই অন্ধকার রাত্রে অসহায় হয়ে আমাকে ডাকছে। কি করি আমীরের বলিষ্ঠ বাহু বেষ্টনা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনার জন্য এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু হিতে বিপরীত হল। আমীর আমাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে নিবিড় বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ করল।

সুলেমানের ডাক শুনে ধক্ করে উঠল আমার বুক। মনে হল আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন সুলেমানের এভাবেই কাটবে। আমি নিজে পুড়ে যাব, সুলেমানও পুড়বে। আমাকে ছেড়ে চলে গেলেইত পারে। অকৃতজ্ঞ হতে পারি না। অথচ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মত সামর্থ্যও আমার নেই। স্বগতোক্তির মত বললাম, সুলেমান তোমাকে ছাড়তে পারি না। কাছে টেনে রাখার সাহসও আমার নেই।

সুলেমান উঠে দাঁড়িয়ে ডাকছে, তুমি কোথায়, আমি যে স্বপ্ন দেখেছি তুমি মরে গেছ!

সুলেমান চীৎকার করে বলল, তুমি আমাদের দুজনের টানা-পোড়েনে মারা যাবে না ত!

আমার সমস্ত কষ্ট জগদ্দল পাথরের মত আবার আমার বুকে জেঁকে বসল। এ দুজনকে খুশী করার জন্য আমি যে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করছি তা এক এক করে আমার মনে পড়ল। কান্না পেল। ডুকরে ডুকরে কাঁদলাম।

—আর কোন দিন আমার দেখা পাবে না, চলে যাচ্ছি। তুমি এবার সুখে থাক।

সুলেমানের কথা শুনে মনে মনে বললাম, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারলে এত দুঃখ পাচ্ছি কেন।

আমীরের বাহু-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে এলাম। বললাম, যাই ঘটুক যতক্ষণ এ-দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না, সুলেমান।

আমাকে সুলেমান কাছে টেনে নিল। আমি তার বক্ষ-লগ্না।

একটি নক্ষত্র খসে পড়ল।

পরের দিন সুলেমান সহরে চলে গেল। আমীর কথা বলল না আমার সঙ্গে। আমীরের কাছে বসে কথা বলার চেষ্টা করছি। এখন আমি একটু নিশ্চিন্ত। সুলেমান নেই তাই। রাত্রে প্রতি মুহূর্তে প্রমাদ গুনছি এই বুঝি সুলেমান এল!

—চল বেড়িয়ে আসি।

আমীরের মুখে কথা ফুটল। ভাবছি সুলেমান এসে আমাকে খুঁজবে। না পেয়ে অন্ধকারে পা বাড়াবে। তবু গররাজী হতে পারিনি। বেরুলাম।

মিশকালো অন্ধকার। কখনও আমীরের হাত ধরে, কখনও কাঁধ ধরে চড়াই-উৎরাই করে, ক্ষেতের আল বেয়ে হাঁটছি।

আকাশ কৃষ্ণবর্ণ। কখনও পাশে, কখনও তার বুকের উপর শুয়ে আনন্দানুভূতিতে বিভোর হয়ে আছি বালিয়াড়ির উপর। যা দেওয়ার উজাড় করে দিচ্ছি, যা পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় নিচ্ছি গুণে।

তারপর উঠে আবার বেড়াতে শুরু করেছি।

পায়ে পায়ে বালিয়াড়িকে পিছনে ফেলে পাহাড়ের কাছে এসেছি। পাহাড়ে উঠছি। অন্ধকার যতই গাঢ়ই হোক আমীর আমার পথ চেনে। চোখ বুজে পাহাড়ের মাথা থেকে নিচে নামতে সে পারে।

ঝপ্ করে একটা শব্দ হলো। কিছু একটা জলে পড়েছে। আমি বললাম, মনে হচ্ছে কিছু জলে পড়ে ছট্‌ফট্ করছে।

আমার কথা ফুরোতে-না-ফুরোতেই আর্তনাদ শুনলাম!

—এ কি সুলেমান আর্তনাদ করছে! সুলে—মান···! চীৎকার করে ডাকলাম, সুলে—মান! পাগলের মত এদিক-ওদিক তাকিয়ে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলাম সুলেমানের কণ্ঠস্বর।

কানকে অবিশ্বাস করতে পারছি না। আবিষ্কার করতে না পারায় সেই আওয়াজ বিশ্বাস করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। আমীর আমাকে তার শক্ত হাতে ধরে টেনে নিজের কাছে রাখল।

—আ, ওদিকে ঝুঁকবে না, ওটা খাদ।

আমীর আমাকে ছাড়ছে না, মুহূর্তের জন্যও না।

—আমীর! আমীর!! আমার সুলেমান যে খাদে পড়েছে!

—আবার ডাকো।

কণ্ঠস্বরে বুঝতে পারলাম না আমীর রাগ করে বলছে কিনা।

আবার সেই আর্তনাদ!

—আমীর, সুলেমান বেঁচে আছে, ঐ তো তার গলা শোনা

যাচ্ছে। আহা সুলেমান যদি মারা যায় আমি বাঁচতে পারব না। সুলেমান ছাড়া আমি বাঁচব কি করে!

পরক্ষণেই ঠোঁট কামড়ালাম।

আমীরকে এভাবে বলা ঠিক হয়নি! আমীর নির্বিকারভাবে বলল, আবার ডাকো।

—সুলে—মান!

আবার শোনা গেল সুলেমানের আর্তনাদ।

—ঐত সুলেমান বেঁচে আছে! আমীর কী করছ তুমি?

—ব্যস্ত হয়ো না। ওকে জিজ্ঞেস কর কোথায় আছে।

—সুলে—মান, তুমি কোথায়?

—বিদায়! খাদে পড়ে আছি। একটি ডালকে ধরে ঝুলছি। আর পারছি না। হাত টন্‌টন্‌ করছে। পড়ে যাচ্ছি। তুমি মহৎ। তোমার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে আমি প্রস্তুত ছিলাম। তুমি কথা দিয়েছিলে ঘরে থাকবে। তাই তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে···

আহা আর শুনতে পারছি না। সে কথা ভুলে কেন যে আমি আমীরের সঙ্গে এলাম। আমার জন্যই তো সুলেমানের এই অবস্থা! আমার সুলেমান আমার জন্যই মারা যাচ্ছে!

সেই অন্ধকারে খাদের গভীর থেকে আবার চিৎকার শোনা গেল, তুমি আমীরকেই ভালবাস! আমীরকেই তুমি চাও! আমি জানি তুমি আমাকে চাও না। আমার মরাই ভাল।

আমীর হঠাৎ চীৎকার করে বলল, দাঁড়াও দু'এক মিনিট ডালটাকে ধরে রাখ।

আমি আর পারছি না, আঙ্গুলগুলো টন্‌টন্‌ করছে, বিদায়···

—ছাড়বে না, আমি আসছি।

আমার বীর আমীর সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে খাদে নামল আমার সুলেমানকে উদ্ধার করতে!

জীবনের সে'কটি মুহূর্ত যে কী ভাবে কাটিয়েছি তা ভাষায় বোঝাতে পারব না। এই বুঝি আমীর পড়ে গেল! এই বুঝি সুলেমানকে হারালাম! সেই অন্ধকারে খাদে কি হচ্ছে কিছুই টের পাচ্ছি না। এমন কি ডাকতেও ভয় করছে!

আমীরের উপর আমায় বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস যে কেন ছিল না এখনও তা বুঝি না। আমীর কি ধাঁই করে কোন নীচ কাজ করে বসবে? কি জানি? আমি হয়ত নীচ তাই আমীরকে সন্দেহ করছি! আমীর কি সত্যি তাকে বাঁচাতে গেছে, না কি নিজের হাতে তাকে খুন করতে গেছে! যদি দু'জনেই খাদের জলে ডুবে মরে!

অন্ধকারের বুক চিরে পাহাড়ের মধ্যকার সেই খাদ থেকে আমীর নিয়ে এল সুলেমানকে, আমার বীর আমীর!

—আমীর এসেছ!

—আগে ওকে দেখ।

সুলেমানকে দেখার জন্য ঝুঁকতেই হঠাৎ একটি প্রশ্ন জাগল মনে—সুলেমানের প্রতি আমীরের সেই ঈর্ষা গেল কোথায়? সত্যি কি তার মনে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে!

সুলেমানের গোঙানী শোনা গেল।

—এই যে সুলেমান, আমি তোমার কাছেই আছি।

॥ নয় ॥

একটা বাজতে না বাজতেই জ্যোৎস্না কোথায় হারিয়ে যাবে। চল তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়া যাক্, আমীর বলল।

আমরা উঠতে যাচ্ছি, সুলেমান এল। সে-ই যে সেদিন

ভোরে সুলেমান চলে গিয়েছিল, এই এল। খাওয়া-দাওয়া করেছি বটে কিন্তু আমীর কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে গেল। সুলেমানকে দেখেই মুখ গোমড়া করে ছিল। আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম যে-সুলেমানের উপর এত রাগ—সেই সুলেমানকেই উদ্ধারের জন্য সেই মিশকালো অন্ধকারে আমীর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কি করে! সুলেমানের সম্পর্কে কিছু বলতে সাহস হচ্ছে না। সুলেমানের সঙ্গেও কথা বলিনি।

আমীর একটু দূরে পায়চারি করছে। আমি আর সুলেমান ঘরের সামনে বসে আছি। বেড়াতে বেরুনোর তাড়া যেন এখন আর নেই।

—সুলেমান, এতদিন ছিলে কোথায়?

সুলেমান আরও কাছে বসে স্বর নামিয়ে বলল, অনেকবার ভেবেছি, ভেবেই বলছি, তোমাকে না দেখে আমি থাকতে পারি না।

বিড়বিড় করে কত কষ্টেই না বলল। বেচারা এতদিন কোথায় কিভাবে কাটিয়েছে কে জানে। আমার জন্য আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার জন্য, মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হয়েও বেচারা আমাদের ঘরে আসেনি এতদিন। তাকে আরও কাছে টেনে নিলাম। আমীর দেখবে বলে কোন ভয় সেই মুহূর্তে করল না। গুনগুন্ করে গান ধরেছি। আমার ঠোঁট তার চোখের পাতা স্পর্শ করছে। কিছুক্ষণ পরে আমিও চোখ বুজলাম।

—ঘুম পাচ্ছে, চল ঘুমোই—দূর থেকে কথাটা আমীর ছুঁড়ে দিল। চমকে উঠে চোখ খুললাম। বেচারা আমীর আমার দিকে ঐ কথাটি নিক্ষেপ করার আগে মনে মনে কতবার না ঐ কথাটি আবৃত্তি করেছে! আমার কী দুঃসাহস। সুলেমানকে অত কাছে টেনে নিয়ে তাকে চুমো খেয়ে তার পাশেই শুয়ে আছি। আমীরের ডাক শুনে আমি চমকে উঠেছি বটে কিন্তু মন ভয় পেল না। আস্তে

আস্তে সুলেমানের মাথাটা আমার হাত থেকে নামিয়ে গেলাম আমীরের কাছে।

—আরও কাছে এস। আমাকে কাছে টেনে নিয়ে অক্টোপাশের মত হাত দিয়ে পা দিয়ে ঠোঁট দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছে। অসহায়ভাবে শুয়ে থেকে সুলেমানের দিকে তাকাচ্ছিলাম। রাত্রে দেখি সুলেমান আমার পায়ের কাছে বসে আছে। কথা বলতে গিয়ে ভয় পেলাম, পাছে আমীর উঠে পড়ে। আমীর নড়েনি। খুব সাবধানে ওর কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে উঠলাম।

সকালে উঠে দেখি সুলেমান নেই, আমীরও নেই। কিন্তু মনে ওদের জন্য কোন উদ্বিগ্নতা দেখা দেয়নি। ওদের জন্য ভেবে ভেবে হয়ত মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছি দূরের পাহাড়ের দিকে—সেই পাহাড়কে তিনদিক থেকে ঘিরে রাখা ঝাঁ-ঝাঁ রোদের দিকে। পাহাড়গুলো যেন নড়ছে। ভাল লাগছে ওদিকে তাকিয়ে বসে থাকতে।

আমীর এল। আমার উপর তুটো জামা ছুড়ে দিয়ে বলল, আজ থেকে এগুলো সব সময় পরে থাকবে।

মনে হল যেন আমার গালে টেনে চড় কষেছে। বিকেল পর্যন্ত আমীর আমার সঙ্গে একটাও কথা বলল না। তার চেয়ে সে যদি সুলেমানের সম্পর্কে আমার মন পরীক্ষা করার জন্য নানা চেষ্টা করত, আমার কথা বিশ্বাস না করে আমাকে গাল দিত আর মারত তাতেও আমি এত ব্যথা পেতাম না, বরং ভয় আমার কিছুটা কেটে যেত। সেই থমথমে আবহাওয়া আমার কাছে অসহ্য লাগছিল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদে তিতিক্ষে মেজাজ নিয়ে সারা তুপুর, সারা বিকেল আমারই সামনে আমীর বসে আছে। ওর দিকে তাকিয়ে বিরক্তিতে মন আমার গুমরে উঠছে।

রাত্রেও ঠিক তেমনি কোন কথা বলেনি। টু শব্দটি না করে

দুজনেই শুয়ে পড়লাম। আর পারছি না। দম নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছে। আমীর আমাকে আরও কাছে টেনে নিল। আমীরের হাতে যে এত শক্তি এর আগে কোনদিন টের পাইনি। তার ভয়ঙ্কর তীব্র-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেই অন্ধকারেও বিড়ালের চোখের মত জ্বলছে। তার হাতের আঙুলগুলো আমার শরীরের এক একটি অংশ যেন নিংড়ে নিঃশেষ করে দিতে চাইছে। তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রচণ্ড আকর্ষণে বলিষ্ঠ-বন্ধনে গ্রন্থিতে-গ্রন্থিতে টেনে রাখতে চাইছে।

অনেক কষ্টে দম নিয়ে বললাম, আমীর তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, আজ আমি যে আর পারছি না।

তার কঠিন ঠোঁটগুলো আমার ঠোঁটকে পিষে ফেলতে চাইছে। তার সামনের দাঁত আমার নিচের ঠোঁটে গেঁথে গেছে। ওর আজকের এই উন্মত্ততা দেখে মনে হচ্ছে মাত্র একটি রাত্রি উপভোগের জন্য সে যেন শহরের এক সুন্দরী ব্রাহ্মণ-কন্যাকে পেয়ে গেছে। এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়লে আমি যেন অদৃশ্য হয়ে যাব। সে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে আমাকে। সেই রাত্রে কখন মাটিতে আবার কখন গড়াতে গড়তে নিয়ে গিয়ে বালিতে ফেলে সেই নক্ষত্রখচিত আকাশের নিচে আমাকে আমীর ভোগ করল নিঃশেষে। আমার যা দেওয়ার দিতে হল। শেষ রাত্রে আমি ক্লান্ত হয়ে আমার চুল দিয়ে দিয়ে তার বুক আর মুখ ঢেকে দিলাম। আমার জামার ছেড়া টুকরোগুলো পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। আমি অবশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আলতোভাবে দুটো আঙুল আমার গাল স্পর্শ করল। চোখ খুলে দেখি সুলেমান আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে আমাকে টেনে তুলছে। আমি বা উঠি কি করে। আমার হাত আমীরের গলার নিচে। আমার চুল তার পিঠের নিচে। তার পা আমার

পায়ের উপর। আমীর যেন পাথর বনে গেছে। একটুও নড়ছে না। সুলেমানের কী বুকের পাটা! বিশ্বাস করতে কষ্ট হল এই কি সেই সুলেমান। আমার খুব ভয় করল। কেন জানি না হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল সেটাই যেন শেষ রাত্রি। এই সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে জীবন, আনন্দ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সেটাই বুঝি শেষ রাত্রি। আশ্চর্য সুলেমান আমাকে ডাকছে।

আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর গুটি গুটি পা পা করে সুলেমানের পিছনে পিছনে গেলাম।

সুলেমান আমার দিকে তাকাচ্ছে। অন্ধকারের বুক চিরে তার চোখগুলো যেন আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার চেষ্টা করছে। কোন অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করছে। তার পা টিপে টিপে চলা, হাতগুলো কম নাড়া, সবকিছু যেন একটা ইঙ্গিত বহন করছে। এসব দেখেশুনে আমার মাথা ঘুরছিল। চোখের পাতাগুলো আর টেনে রাখতে পারছি না। ক্লান্তি আর অবসাদে শরীর যেন ভেঙে পড়ছে। পা টলছে। মাতালের মত হাঁটছি। সুলেমান হাঁটতে হাঁটতে কি যেন বলছিল। যে-কথা শুনিনি তার কোন প্রশ্নই ওঠে না। যা শুনেছি তা সেই মুহূর্তেই ভুলে গেছি। সব কথা মনে নেই। কিছু কিছু মনে পড়ছে। সে বলছিল, আর আমি চুপ করব না। তোমাকে না দেখে আমি থাকতে পারি না! বেশ বুঝতে পারছি আমার অজান্তে সে তোমাকে নিয়ে যাবে। আমাকে সে কিছু করবে না। তোমাকে মেরে ফেলবে। তুমি আমার, আমি তোমাকে কারও হাতে তুলে দিতে পারব না। চোখের সামনে দিনের পর দিন সহ্য করতে পারব না। আমার সঙ্গে চলে এস—আমার গোটা-জীবন তোমার সেবায় নিয়োগ করব।

—কোথায় আবার যাব? কোথায় নিয়ে যেতে চাইছ আমাকে?

—মক্কা, কাশী, লাহোর যেদিকে খুশী, যেদিকে ত্বচোখ যায়। শুধু তুজনে থাকতে চাই একসঙ্গে। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব। ওর কবল থেকে, ঐ রাক্ষসের কাছ থেকে, ঐ শয়তানের থাবা থেকে তোমাকে উদ্ধার করবই। আর কোনদিন সে যাতে তোমার নাগাল না পায় তার ব্যবস্থা করব। তোমাকে সে কত কাঁদিয়েছে। তোমার অমন সুন্দর কোমল শরীরটাকে ত্বমড়ে—মুচড়ে—নিঙড়ে শেষ করে দিচ্ছে আমারই চোখের সামনে। আর কতদিন আমি সহ্য করব। তুমি আমার। একান্তভাবেই আমার। আমি কিন্তু আর…

—থাম সুলেমান, চল কোথাও গিয়ে একটু বসি।

—এখানেই বস।

তারপরেই যেন সে আমার কাছে ধেয়ে এসে হাত ধরে টান দিল। অন্ধকারে আমাদের পাগুলো এলোপাথাড়ি পড়ছে।

—ছাড় সুলেমান, আর ভাল লাগছে না, আমার ঘুম পাচ্ছে।

সুলেমান তখনও টানছে। আমি পড়ে গেলাম। আমার শরীর পড়ে আছে অর্ধেক বালিতে, অর্ধেক জলে। ঠিক মনে পড়ছে না কোথায় পড়েছিল শরীরটা। শরীরের প্রতিটি তন্ত্রী যেন বিশ্রাম চায়। একটুও নড়তে ইচ্ছা করছে না। সেই অন্ধকারে সেখানেই পড়ে থাকতে ভাল লাগছে। সুলেমানের শরীর অর্ধেক আমার উপর, অর্ধেক বালির উপর। ওর গায়ে একটা হাত দিয়ে চোখ বুজলাম।

—এখানে ঘুমুলে চলবে না। ওঠ চলে যাই এখান থেকে।

—কোথায় যাব?

—নাক বরাবর।

—আমি হাঁটতে পারছি না, আমি যাব না। থাম, আমার ঘুম পাচ্ছে।

—যাবে না? সত্যি যাবে না? ওর কাছেই থাকবে? আর তোমাকে রাখব ওর কাছে! তুমি আমার! কোনক্রমেই আমি…

কথাগুলো কি সুলেমানই বলছে! নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি শক্তিহীন। সুলেমান আমাকে তাতাচ্ছে।

—তুমি কি তাহলে ওর কাছেই থাকবে? তুমি কি ওর নিজস্ব সম্পত্তি?

মাত্র দুদিন আগেই না আমীর একে মরার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সুলেমান কি এর মধ্যেই সে কথা ভুলে গিয়েছিল? সেই মুহূর্তে আমার নিজেরও কিন্তু সে-কথা মনে পড়েনি। এখন মনে পড়ছে। মানুষ কত বেশী পরিবর্তিত হলে এটুকু কৃতজ্ঞতা বোধও রাখে না। সুলেমান অন্য ব্যাপারে যেন নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত কিন্তু আমাকে সে হারাতে রাজী নয়। হঠাৎ আমার দুটো হাত ধরে সুলেমান বলেছিল, এই পথে এস। তোমার জন্যে, তোমার এই ঠোঁট, তোমার এই হাত, তোমার বুকের এই পদ্ম-কোরক…

সেই রাত্রের অন্ধকারে আমাকে সম্পূর্ণভাবে ভোগ করল। উজাড় করে দিতে হল আমার যা দেওয়ার। তার মনে ব্যথা দেওয়ার মত শক্তি আমার ছিল না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার সামর্থ্য ছিল না আমার।

আমীর গালের যে অংশে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল সেই জায়গায় সুলেমানের পাতলা নরম ঠোঁটের ছোঁয়া লাগছে। আমি চোখ বুজে অনেকক্ষণ শুয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে দেখি সেই ভৌতিক অন্ধকারে আমীর দাঁড়িয়ে আছে! চোখগুলো তার জ্বলছে। হাতে ছোরা ঝক্-ঝক্ করছে। বেশ বুঝলাম, আমাদের দুজনের গায়েই ওটা গেঁথে যাবে।

চুলের ঝুঁটি ধরে আমীর আমার উপর থেকে সুলেমানকে দাঁড় করিয়ে দিল। সুলেমানের জন্য ভয়ে আমার বুক লাফাতে লাগল। ছোট্ট পাখী যেন বিড়ালের মুখে রয়েছে। সুলেমান গোঁ-গোঁ করছে। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আমীরের মুখোমুখি হলাম। সুলেমানকে আড়াল করে দাঁড়ালাম। গম্ভীর গলায় আমীর বলল, ওকে ছাড়।

—আগে আমাকে মেরে ফেল! তারপর...

—সত্যি নাকি?

—সত্যি।

—বেশ।

তারপর সুলমানকে যাতে সে দেখতেও না পায় সেইভাবে আমার হাত দিয়ে, বুক দিয়ে, জানু দিয়ে, চুল দিয়ে ঢেকে রাখলাম তাকে। অনুভব করছি ছোরাটা আস্তে আস্তে নামছে আমার উপর। চোখ বুজে আছি। চোখে ভাসছে আমার উকিল স্বামীর চেহারা,......তার বাড়ি...আইনকানুনের বই...কোর্ট কাছারী...

কঠিন নীরবতা। দীর্ঘ দশমিনিট বোধ হয় কেটে গেছে। চোখ খুলে দেখি কেউ নেই!

উঠে দেখি আমার মুঠোতে যে বালি সে-বালি ভিজেছে রক্তে! পাশে আমীর পড়ে রয়েছে। সুলেমান থমকে দাঁড়িয়ে বলল আমীর!

—সুলেমান, ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আন, যাও।

সুলেমান ইতস্তত করে বলল, আমার জন্য তুমি শেষ পর্যন্ত ওকে...

সুলেমান! কোন কথা শুনতে চাই না। যাও, আগে ডাক্তার নিয়ে এস।

—তোমাকে এখানে একা ছেড়ে...

সুলেমান, আমাকে চটিও না।

মুহূর্তে সুলেমান অদৃশ্য হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি আমীরের গোটা শরীর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। গায়ের যেখানে হাত দিই সেখানেই রক্ত। আমার আমীরের কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল রক্তে ভিজে গেছে। তার সেই বলিষ্ঠ হাতের আঙুলগুলো রক্তে ভিজে চপচপ করছে। আর্তনাদ করে উঠলাম, আমীর! আমীর!!

আমার চোখ খুলল।

—একি করলে আমীর! কেন করলে এসব! এখন আমার কি হবে! তোমাকে ছেড়ে বাঁচব কি করে, আমীর? নাও এবার নিজের হাতে আমাকে মার।

কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

—তোমাকে মেরে ফেলার কথা চিন্তা করিনি কখনও। তোমাকে কিছুতেই মারতে পারি না আমি। হয় আমি, না হয় সুলেমান যে-কোন একজন থাকবে এই পৃথিবীতে। তুমি অবশ্য সুলেমানকেই চাও।

—তুমি মারা যেতে চাইছ কেন আমীর?

—তোমাকে ছেড়ে বাঁচাতে পারব না আমি।

—ছাড়ার কথা ওঠে কেন?

—সুলেমানের সঙ্গে ভাল করে তোমাকে......একটু আমার কাছে এস না।

হাত বাড়াল আমার মাথায় হাত দেওয়ার জন্য। তৎক্ষণাৎ হাত পড়ে গেল বালিতে। হৃদয় আমার বিদীর্ণ হল। আমীরের যে হাত আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছিল এখন তা কত দুর্বল!

—আমীর, আমীর! বিশ্বাস কর তোমার প্রতি আমার ভালবাসা একটুও কমেনি। বেচারা সুলেমানকে আমি অবহেলা করতে পারিনা। আসলে আমার জীবনে তোমাকেই প্রয়োজন।

তুমি এমন সর্বনাশ কেন করলে আমীর "বুকচাপড়ে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। আমীর রা কাড়ল না। আস্তে আস্তে তার দম বন্ধ হয়ে গেল। মাথা তোলার চেষ্টা করে দেখি আমার চুল আমীরের মুখে। ওর দাঁত লেগে গেছে। আমীর আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। জীবন্ত আমীরকে দেখেছি; ভালবেসেছি। তখন তার শব দেহ দেখে কেন জানি না ভয় করছিল। চারদিক তাকালাম উদাস দৃষ্টি মেলে।

আমীরের গাল কী ঠাণ্ডা! ওর গালে হাত দিতে ভয় করছে। চুমো খেতে ইচ্ছে করলেও সেই মুহূর্তে মনে হল এ-আমীর সে-আমীর নয়।

হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলাম, আমীর! আমার আমীর!! নিজের স্বরে নিজেই চমকে উঠলাম। মনে হল অত জোরে ডাকলে হয়ত উঠে পড়বে। সন্দেহ জাগল সত্যি কি আমীর মরে গিয়েছে?

ঘন অন্ধকার! পথ আবিষ্কারের কোন সুযোগ নেই। কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। একনাগারে শেয়াল ডাকছে। শেয়ালগুলো এই শবের সন্ধান পেয়েছে নাকি? আসবে নাকি দল বেঁধে? ইচ্ছে করল ছুটে পালাই। শীত যেন কাঁটার মত বিঁধছে। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছি। অনেকক্ষণ আমীরের দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। শরীর কাঠ হয়ে গেছে। তার শরীরের সমস্ত উত্তাপ লোপ পেয়েছে। রাত যেন আর শেষ হতে চায় না!

কা—কা—কা—কা। পূবদিকে সাদাটে ভাব। সেই সামান্য আলোতে দেখলাম আমীরের গায়ে ছোরা অনেকখানি গেঁথে আছে। আমার বুক হা-হা করে উঠল। যত অন্ধকার কাটে আলোতে আমীরের অবস্থা আরও বেশী করে অনুভব করি। বুক তত বিদীর্ণ হয়।

সুলেমান, ডাক্তার এবং পুলিশ একসঙ্গে এল। সুলেমানের হাতে হাতকড়া!

—একি হল সুলেমান, তোমার হাতে...

—আমীরকে যে আমি খুন করেছি।

অবাক হয়ে বললাম, তুমি? না সুলেমান. তুমি নও। আমীর নিজেই নিজের গায়ে ছোরা বসিয়েছে।

সুলেমান অবাক হল। পুলিশের দৃষ্টি অর্থহীন।

—এরা সব এল কেন?

—আমি ডাক্তারকে ডেকেছি। ডাক্তার পুলিশ ডাকল। পুলিশ আমাকে জেরা করায় বললাম, আমিই খুন করেছি।

—কেন তা বললে সুলেমান?

—আমি জানি না যে আমীর নিজের গায়ে...

—জানি না বলেই কি...

—আমি নিজেই ছোরা বসিয়েছি মনে করলাম...

—তা মনে করলে কেন? সত্যি কথা বলত কেন বলেছ?

পুলিশের দিকে আড়চোখে চেয়ে সুলেমান আমাকে বলল, আমি ভেবেছিলাম তুমিই ছোরা বসিয়েছ।

—না, আমার নিজেই নিজের গায়ে ছোরা বসিয়েছে।

তারপর আমার উপর পুলিশের সন্দেহের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হল। ভুল সংশোধন করার ভাণ করে বললাম, না-না ওসব বাজে কথা, আমিই আমীরকে খুন করেছি!